নভেম্বর ২০১৮ ❑ কার্তিক - অগ্রহায়ণ ১৪২৫

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

আসফিয়া জান্নাহ রিয়াসা, তৃতীয় শ্রেণি, সাভার ল্যাবরেটরী স্কুল, সাভার, ঢাকা।

সাদিয়া হোসেন মিম, পঞ্চম শ্রেণি, এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বাড্ডা

সম্পাদকীয়

আমরা বাস করি পোকামাকড় বা কীটপতঙ্গ ভরা পৃথিবীতে। কখনো কখনো এরা আমাদের বিপদের কারণ হয় বৈকি, আবার এরা না থাকলে পৃথিবীতে অন্য প্রাণীদের টিকে থাকা কিন্তু মুশকিল হতো। প্রাণের ভারসাম্য রক্ষায় ওরা আমাদের বন্ধু। আর তাই, নবারুণ হাজির করেছে পোকামাকড় বন্ধুদের। পোকামাকড় নিয়ে সায়েন্স ফিকশন আছে, তেমনি আছে এদের নিয়ে গবেষকদের মূল্যবান লেখা।

শীত আসছে। হেমন্তের শেষ বেলায় হিম হিম পরশ টের পাচ্ছ তো? মনে রেখো, শীতে আমাদের দেশে যে পরিযায়ী পাখিরা বেড়াতে আসে, তারাও কিন্তু আমাদের বন্ধু। বেড়াতে আসা বন্ধুকে শিকার করা অন্যায়, ঠিক বলেছি না?

ঋতু পরিবর্তনের এই সময়টায় শরীরকে সুস্থ রেখেই পরিবর্তনকে উপভোগ করো। শুভ কামনা তোমাদের জন্য।

সূচি

নিবন্ধ

২ নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৩ কীটপতঙ্গের বিচিত্র জগৎ/ রেজাউর রহমান
৬ ভিমরুল বোলতা ও মৌমাছি/ শরীফ খান
১৩ আজব কিন্তু গুজব নয়/ মেজবাউল হক
১৮ লেডি বার্ড বিটল/ প্রফেসর আবু হেনা মুস্তফা কামাল
২০ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্ব আছে মাছিরও/ মো. আফতাব হোসেন
২৫ ডেঙ্গু ভাইরাস ও বাহক মশা এডিস
প্রফেসর ড. মোস্তফা দুলাল
৩২ কীটপতঙ্গ নিয়ে মানুষের বিশ্বাস
নাসরীন মুস্তাফা
৪৪ পোকামাকড়ের খবর/ মাহমুদুর রহমান
৪৭ আলতাপরি/ ড. আ ন ম আমিনুর রহমান
৬০ রহস্যময় স্থাপত্য/ খালিদ বিন আনিস
৬১ বিজয় ফুল উৎসব/ শাহানা আফরোজ
৬২ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮
জান্নাতে রোজী
৬৩ সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল:চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৬৩ সঠিক নিয়মে বেড়ে উঠি/ মো. জামাল উদ্দিন
৬৪ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

সায়েন্স ফিকশন

৩৬ সুন্দর কীট সুন্দর পতঙ্গ/ কমলেশ রায়
৪৫ এখনও বৃষ্টি হয়.../ অর্ঘ্য দত্ত

প্রধান সম্পাদক: মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন **সিনিয়র সম্পাদক:** মোঃ এনামুল কবীর **সম্পাদক:** নাসরীন জাহান লিপি
সহ-সম্পাদক: শাহানা আফরোজ, মো. জামাল উদ্দিন
সম্পাদকীয় সহযোগী: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা, মেজবাউল হক, সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
সহযোগী শিল্পনির্দেশক: সুবর্ণা শীল **অলংকরণ:** নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৮৫, **E-mail :** editornobarun@dfp.gov.bd, **ওয়েবসাইট:** www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ: সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০, **মূল্য:** ২০.০০ টাকা। **মুদ্রণ :** মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

গল্প

১৭ ঘাস ফড়িং/ নাসির ফরহাদ
২৪ হুক্কা হুয়া/ হাসান ইকবাল
৩০ একটা ছিল ফড়িংবিবি/ আহমাদ স্বাধীন
৪৯ এক যে ছিল নীল/ ফারুক নওয়াজ
৫৩ আগুন চুমো/ আঁখি সিদ্দিকা
৫৪ অংকুর/ জান্নাতুল ফেরদৌস আইভী
৫৭ মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি/ আবুল কালাম আজাদ

কবিতার হাট

১৪ সুমাইয়া আক্তার/ আদনান শাহরিয়ার
১৫ আব্দুল মালেক জাগরণী/ এইচ.এম.কবির আহমেদ/ তরিকুল ইসলাম সুজন
১৬ মোরশেদ কমল/ মো. আরিফ হোসেন লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা
২৩ খুরশীদ আলম বাবু
৩১ জাকির হোসেন কামাল
৪৬ আতিক আজিজ
৪৮ জোবায়ের মিলন
৫৬ পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী/ সালেহীন

আঁকা ছবি

২য় প্রচ্ছদ: আসফিয়া জান্নাহ রিয়াসা, সাদিয়া হোসেন মিম
শেষ প্রচ্ছদ: আদনান-আল-আসাদ

২৩ তাশদীদ তাবাসুম আশফিয়া
৫৯ তাসনোভা আলম (লিশান)

নবারুণ পড়

ওয়েব সাইট: www.dfp.gov.bd

ফেসবুক: nobarun potrika

মোবাইল অ্যাপ: Google Playstore থেকে 'Nobarun' Install করো।

বিকাশ ০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে গ্রাহক চাঁদা দিলেই বাড়ি পৌঁছে যাবে নবারুণ।

নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, লেখায় অনেক দোষ আছে।'

বন্ধুরা, তোমরা তোমাদের লেখা, মন্তব্য বা মতামত আমাদের পাঠাও। কারণ 'নবারুণ' বন্ধুদের খোঁজখবর রাখে আর মন্তব্যগুলো গুরুত্ব দিয়ে পড়ে।

ফেসবুক মতামত

রহিমা আক্তার মৌ : বড়োরাও কী লিখতে পারবে এই পত্রিকায়?

Nobarun Potrika: ছোটোদের লেখাই মূলত কাম্য। বড়োরা লেখা পাঠাতে পারেন। তবে ছোটোদের লেখাকে প্রাধান্য দিয়ে তবেই বড়োদের সেরা লেখাগুলো জায়গা পাবে।

Nusrat Jahan Lucky: বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা কি লেখা পাঠাতে পারবে?

Nobarun Potrika: হ্যাঁ, লেখা পাঠাতে পারবে।

Aktarul Islam: গত দুবছর একটা লেখা ছাপে নাই নবারুণ। মনে হচ্ছে, নবারুণে ছাপানোর মতো লেখার যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি।

Nobarun Potrika: প্রিয় লেখক, নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর জমা দেওয়া সব লেখার ভেতর থেকে বাছাই করে সেরা লেখা নেওয়ার চেষ্টা থাকে নবারুণের। কিশোর বয়সিদের ভালো লাগবে এমন ছন্দ-শব্দ-বাক্য আর ভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ে লেখার অনুরোধ করছি।

Ariyan Khan Mamun: কক্সবাজারে কোথায় পাব?

Nobarun Potrika: এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৯৩৫৭৪৯০।

কীটপতঙ্গের বিচিত্র জগৎ

রেজাউর রহমান

পোকামাকড় বা কীটপতঙ্গ বলতে আমরা সাধারণত ছোটোখাটো বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কোনো কিছুকে বলে থাকি। আসলে ব্যাপারটা মোটেও তা নয়।

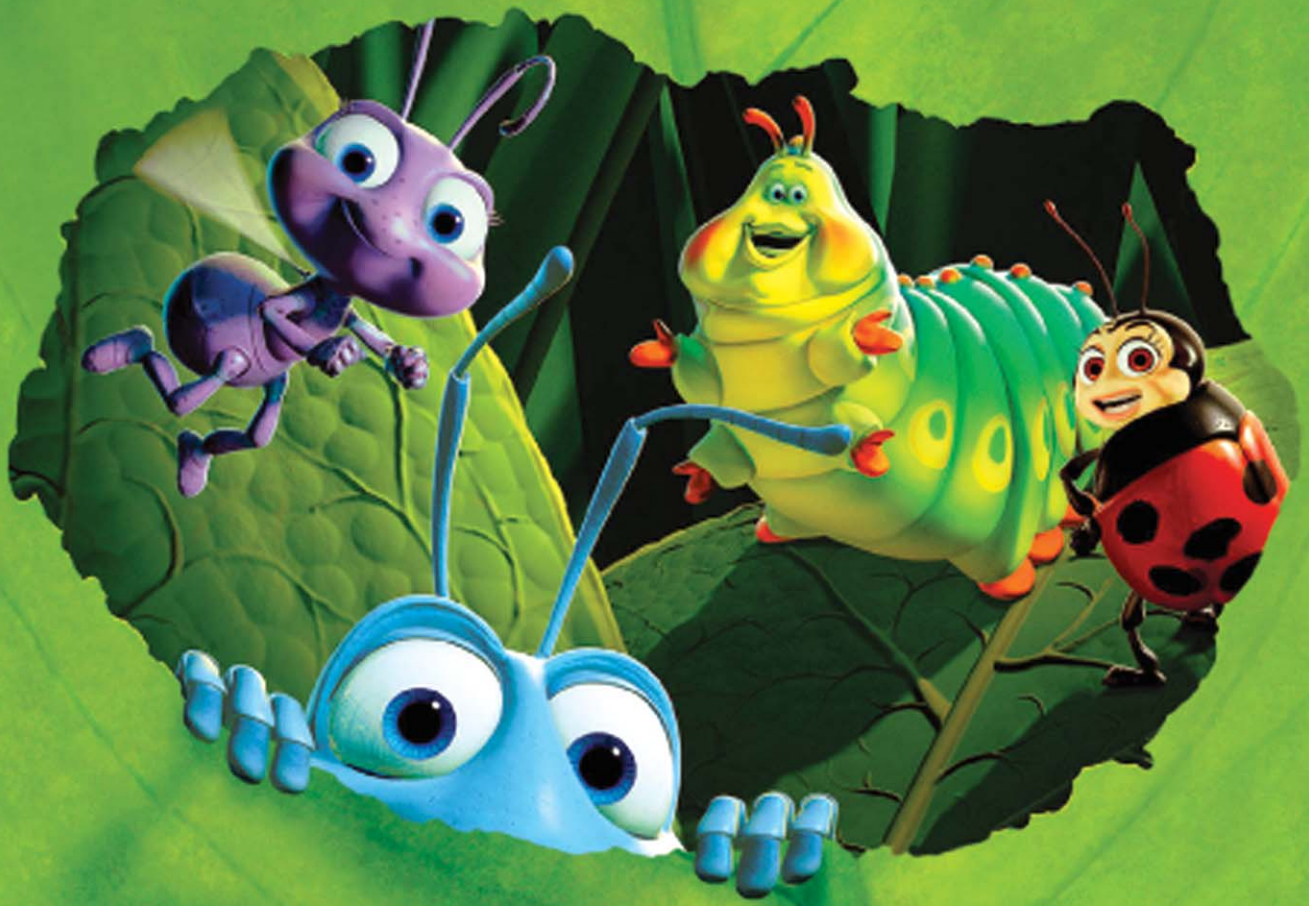

বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান উৎকর্ষ ও গবেষণা চর্চার কেন্দ্রবিন্দুটি দখল করে আছে জীববিজ্ঞান। কীটপতঙ্গ সম্পর্কে জানা ও এর চর্চাও দখল করে আছে আমাদের আজকের জীব চর্চার উল্লেখযোগ্য অংশ। এই কীটপতঙ্গ শ্রেণি সম্পর্কে জানা ও এর কার্যকর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হয়ে আমরা টিকে আছি এই সুন্দর পৃথিবীতে। কেননা, এই যে বিশ্বজোড়া খরা, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, ব্যাধি, মহামারি, বার্ধক্য আমাদের ঘিরে ফেলেছে, এর মূলে রয়েছে কীটপতঙ্গের যত্রতত্র, জানা-অজানা নির্বিঘ্ন বিচরণ এবং এদের ভয়াবহ কার্যকরণ পদ্ধতি।

এই সময়কার এর একটি অতি জনপ্রিয় উদাহরণ তুলে ধরা যায়। তা হলো ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া পীতজ্বরের ভাইরাস বাহক মশা। মানব সভ্যতার আদিকালে মশার উপদ্রপ ছিল, এখনো আছে। ভবিষ্যতেও হয়ত থাকবে। কেননা, আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়যাত্রার উঁচু শিখরে অবস্থান করেও মশা মাছির সাথে আমরা পেরে উঠছি না। এদের নিয়ে নতুন নতুন তথ্য, প্রযুক্তিগত গবেষণা সফলতার ফলাফল আমাদের দৈনিকের পত্রিকায় ও বেরুচ্ছে। আবার দু-দিন পর দেখা যাচ্ছে, এই পদ্ধতিতে মশা কমানো যাচ্ছে না। এগুলো উলটো আরো জোরদার হয়ে উঠছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে।

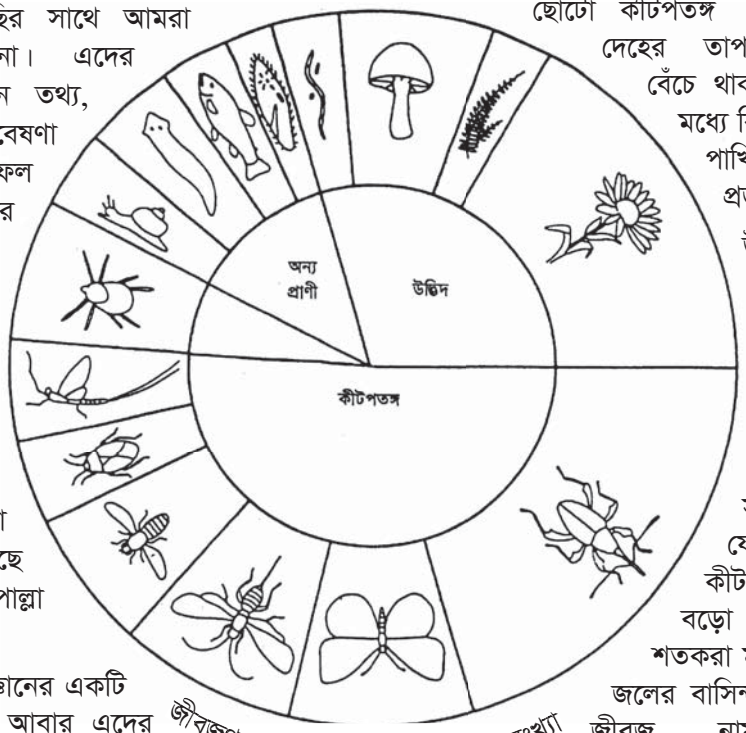

জীবজগতে কীটপতঙ্গের তুলনামূলক সংখ্যা

কীটপতঙ্গ জীববিজ্ঞানের একটি সুপরিচিত শাখা। আবার এদের সাথেই আমাদের দৈনন্দিনের বসবাস। মশামাছি, তেলাপোকা, উইপোকা, ছারপোকা, উকুন ছাড়াও অসংখ্য কীটপতঙ্গের সাথে আমরা জীবনযাপন করি। এগুলোর নেতিবাচক উদাহরণের যেমন শেষ নেই, তেমনি এর ইতিবাচক উদ্ধৃতিও কম নেই। যেমন আমাদের ফুল-ফল, আম, জাম, কাঁঠাল, সবজি উৎপাদন এদের পরাগায়নের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। এছাড়া কীটপতঙ্গ থেকে আমরা সরাসরি মূল্যবান রেশম, মধু, মোম, গালা, কিছু রঞ্জক ও বিরল ঔষধ সামগ্রী পেয়ে থাকি। ল্যাটিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশে কীটপতঙ্গ উপাদেয় খাদ্য হিসেবেও স্বীকৃত। এছাড়া প্রজাপতি ও রঙিন বিটিল প্রকৃতির অনিন্দ্য সুন্দর একটা প্রাণী। আর জোনাকির মিটিমিটি ও ঝিঁঝি পোকার গান কে না পছন্দ করে।

কীটপতঙ্গের বিস্তৃতি পৃথিবীর সর্বত্র। এমনকি উত্তর-দক্ষিণ মেরুর এলাকায়ও। এখন প্রশ্ন হতে পারে, বরফ জমা শীতের দেশে এগুলো কেমন করে বাঁচে? উত্তর হলো- এস্কিমো, তুষার ভালুক, পাখি ও কিছু জলজ প্রাণী রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু এলাকায়। কীটপতঙ্গ উষ্ণমণ্ডলীয় প্রাণী হলেও বরফ জমা শীতে ছোটো কীটপতঙ্গ শোষক প্রাণীর দেহের তাপমাত্রায় স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারে। এর মধ্যে কিছু মাছি প্রজাতি, পাখির ফ্লি, উকুন প্রজাতি রয়েছে।

উদ্ভিদজগৎ বাদ দিয়ে এককভাবে প্রাণীজগতের শতকরা ৭২ ভাগই কীটপতঙ্গ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জীবজগতে কীটপতঙ্গ সবচেয়ে বড়ো গোষ্ঠী। এরমধ্যে শতকরা মাত্র ৩ ভাগ মিঠা জলের বাসিন্দা। কীটপতঙ্গের জীবজ নাম 'ইনসেক্টা' (Insecta)। এটা আন্তর্জাতিক ল্যাটিন ভাষা। অবশ্য ইংরেজির Insect অনেকটা এর কাছাকাছি শব্দ।

জাত বা প্রজাতি পরিসংখ্যানে এ যাবৎ ১০ লক্ষ কীটপতঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে। কীটতত্ত্ববিদদের অনুমান এদের সংখ্যা ৪০ লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে। কেননা, আমরা প্রায়ই পত্রপত্রিকায় নতুন নতুন কীটপতঙ্গের সন্ধানের খবর পেয়ে থাকি। এর একটা সংগত কারণও রয়েছে। কেননা আর এগুলো আকার-আঙ্গিকে যথেষ্ঠ ছোটো হয়ে থাকে। অজানা বিশ্বের সকল খবরও কি আমাদের জানা আছে? অথবা যতটুকু আছে তা বড়ো প্রাণীর তুলনায় এতটা সম্পূর্ণ নয়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্বের এক অধ্যাপক তাঁর এক হিসাবে

দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মাথাপিছু ৩০ কোটি কীটপতঙ্গ রয়েছে। তবে ভরসার কথা হলো, আমাদের এই বিপুল সংখ্যক কীটপতঙ্গের শতকরা ১ ভাগ মাত্র অপকারী হয়ে থাকে, যাকে আমরা পেস্ট (Pest) বলে থাকি। আর বাকি ৯৯ ভাগ কীটপতঙ্গ নানাভাবে আমাদের উপকারে আসে। এদের বিদেশে রপ্তানির মূল্যও যথেষ্ট। যেমন- রেশম, মোম, মধু ও গালা অন্যান্য কীটপতঙ্গ সূত্রে পাওয়া প্রাকৃতিক উপাদান। অনেক দেশই এভাবে কোটি কোটি ডলার আয় করে থাকে।

অন্যদিকে এই অপকারী কীটপতঙ্গ গোষ্ঠীর ১ ভাগের কারণে আমরা যে খাদ্যশস্য উৎপাদন করি এর ১০-১৫ ভাগ বিনষ্ট হয়ে যায়। আমাদের উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এই পরিমাণের সংখ্যা আরো বেশি। বিশেষ করে আমাদের খাদ্যশস্য গুদাম ঘরের দুর্বল ব্যবস্থাপনার জন্য তা ২০-৩০% হয়ে থাকে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করে। কীটপতঙ্গ খায় না এমন জিনিস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমাদের খাদ্যশস্য থেকে নিয়ে মশলাপাতি সব ধরনের মালসামানের উপর এগুলো ভাগ বসায়। এদের আক্রমণ থেকে বইপত্র, কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র কোনো কিছুই বাদ যায় না। এদের নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের যেসব ব্যবস্থাপনা বা বিষক্রিয়া রয়েছে, কয়েকবার ব্যবহারের পরে দেখা যায় সেগুলো তেমন কার্যকর থাকে না। কীটপতঙ্গ খুব সহজে প্রকৃতিতে প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। এগুলো কিছু কিছু ধাতব পদার্থ খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। এদের মধ্যে স্বগোত্রীয় পতঙ্গ খাওয়ারও আগ্রহ রয়েছে। সঠিক অর্থে, কীটপতঙ্গ দমনে আমরা তেমন সফল হতে পারিনি। কীটপতঙ্গ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আনুমানিক ৩৫ কোটি বছরের সময়সীমার এই প্রাণী গোষ্ঠী 'ডেভোনিয়ান' কালে উদ্ভব হয়েছিল জীবাণুভিত্তিক গবেষণায় এমনি সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাবৎ জীবজ এককের প্রাণী জগতের নির্দিষ্ট ধারার একটা জীবনচক্র (Life-cycle) রয়েছে। কীটপতঙ্গেরও রয়েছে। তবে তা উন্নত প্রাণীর মতো নয়। উন্নত প্রাণী বলতে আমরা সাধারণত মেরুদণ্ডী প্রাণীকে বুঝে থাকি। মেরুদণ্ডী বলতে আমরা সেসব প্রাণীকে বুঝে থাকি যাদের শরীর বরাবর (লম্বালম্বি) একটি শক্ত মেরুদণ্ড থাকে। যার সীমা মাছ ব্যাঙ সরীসৃপ পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীতে সীমাবদ্ধ।

কীটপতঙ্গ অমেরুদণ্ডী প্রাণী (মেরুদণ্ডহীন)। তাই এদের জীবনচক্র উন্নত শ্রেণির প্রাণীর মতো নয়। সাধারণত ডিম থেকে নিয়ে শূককীট (Larva), মুককীট (Pupa) ও পরিণত (adult) অবস্থার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এই চার স্তরবিশিষ্ট জীবন প্রক্রিয়াকে 'রূপান্তর' বা metamorphosis বলা হয়। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে শূককীট ও মুককীট আকার আকৃতিতে পরিণত অবস্থা থেকে এত ভিন্ন হতে পারে আজও অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- বিছা পোকা গুটি পোকা থেকে রঙিন উড়ন্ত প্রজাপতি হওয়া। এক জাতের প্রজাপতির গুটি (মুককীট) পোকার আবরণী থেকে অর্থকরী রেশম সুতা সংগ্রহ করা হয়।

তবে কীটপতঙ্গ জগতের সকল সদস্যের যে এক রকমের রূপান্তর হয় তা নয়। এ পর্যায়ে এদের যথেষ্ট ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন, তেলাপোকার ডিম থেকে যে শিশু তেলাপোকা বেরিয়ে আসে তা অনেকটা পরিণত পোকার আকৃতির। তবে দেহ ও রঙের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

এটা প্রমাণিত যে উন্নত-অনুন্নত বিশ্বে কীটপতঙ্গ দ্বারা সার্বিক কৃষিপণ্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২০% এর কম নয়। এছাড়া কীটপতঙ্গের কারণে রোগ এবং মৃত্যুর কারণও কম নয়। এরপরও প্রকৃতিবিদদের বিবেচনায় ছোটো-বড়ো সকল জীবের বেঁচে থাকাই কাম্য। কেননা, এদের প্রত্যেকের প্রকৃতিতে নিজ নিজ ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড রয়েছে। সেখান থেকে গবেষণার মাধ্যমে আমরা নানাবিধ ফায়দা ও উপকার পেতে পারি। তবে কীটপতঙ্গের দ্বারা যে ক্ষয়ক্ষতি আমাদের হয় সে ব্যাপারে সজাগ থেকে এদের নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ মাত্রায় রাখতে হবে। বাড়াতে হবে এদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ। তা হলেই এদের সাথে আমাদের অবস্থান সহজতর হবে। আর আমরাও প্রকৃতি থেকে বিশেষ করে কীটপতঙ্গ থেকে বেশি উপকৃত ও লাভবান হতে পারবো।

লেখক: জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ভিমরুল বোলতা ও মৌমাছি

শরীফ খান

তিনজন মেয়ে শিশু মনের আনন্দে খেলছিল বাড়ির সামনের বাঁশ ঝাড়ের ছায়ায় বসে। গরমের দিনে ছায়ায় বসে বা শুয়ে বাতাস খাওয়ার আশায় বাঁশ তলাতেই একটি বড়োসড়ো বাঁশের চটার মাচানও আছে। ওই মাচানে বসেই তিনটি শিশু মগ্ন ছিল তাদের শিশুজগতে।

জোর বাতাস বইছিল ওদিন। একটু জোরালো ঝাপটা আসতেই বাঁশ ঝাড়ের মাথার দুটি বাঁশে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লেগে ভেঙে যায় ভিমরুলের চাকখানা। অমনি ভিমরুলের ক্রুদ্ধ ভয়ংকর মহাগুঞ্জন (মহা গর্জনও বলা যায় ভিমরুলদের সম্মিলিত গুঞ্জনকে) তুলে শত্রু ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিশু তিনটির উপরে। বিষাক্ত হুল খেয়ে ভয়ার্ত চিৎকার করতে করতে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে থাকে ওরা। পরবর্তীতে হাসপাতালে মৃত্যু হয় নিষ্পাপ তিনটি শিশুর।

ওরা ছিল আপন ৩ বোন। ওরা হলো হাদিফা খাতুন (৬ বছর), ফারজানা আক্তার (৪ বছর) ও মীম (বয়স মাত্র ১১ মাস)।

মেয়েদের মরণ চিৎকারে ছুটে এসেছিলেন ওদের মা তানজিমা বেগম। তিনি হুল খেয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

শিশুদের চিৎকারে প্রতিবেশীরাও ছুটে এসেছিলেন। তারা কুটো ভিজিয়ে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তাতে আগুন জ্বেলে ঘন ধোঁয়ার সৃষ্টি করেন। তারপরে মা ও শিশুদের নেয়া হয় ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে। হাসপাতালেই সন্ধ্যায় ৩ শিশু মারা যাবার পরে মা-কে পাঠানো হয় রংপুরে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ২০১৬ সালের আগস্ট মাসের ৭ তারিখের। দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলা থেকে ২৫ কিমি উত্তরে শিবরামপুর ইউনিয়নের আরাজী লস্করা গ্রামে।

কথায় আছে সাতটি ভিমরুলের হুলের বিষ একটি গোখরা সাপের বিষের সমান। আর ৫০টি ভিমরুলের বিষ মানে একটি রাজগোখরা (King Cobra, এটি বিশ্বের সবচেয়ে বিষধর সাপ, সুন্দরবনে এদের দেখা মিলে, এক ছোবলে এই সাপ বিষ ঢালে ৭ মিলি)। ওই তিন শিশু কতটি ভিমরুলের হুল যে খেয়েছিল!

বাঁশ ঝাড়ের সম্মিলিত আগায় যে ভিমরুলের চাক ছিল, তা বাড়ির কারো নজরে পড়েনি। পড়েনি প্রতিবেশীদেরও নজরে। তাহলে কৌশলে চাক অবশ্যই ভেঙে দেয়া হতো। কিন্তু চাক হয় ক্যামোফ্লেজ রঙা। গড়ন হয় ছোটো ফুটবলের মতো একেবারে গোলাকার অথবা কুমড়ো বা বড়োসড়ো আনারস আকৃতির বা বেতের ধামার মতো বড়ো। প্রবেশ মুখ বা প্রবেশ দরজার শিল্পিত ফিনিশিং দেখলে অবাক হতেই হয়।

ভিমরুলেরা চাক গড়ে সাধারণত বর্ষা-শরতে। শরৎ ও গ্রীষ্মেও দেখা মেলে। ঘন ঝোপঝাড়, দুর্ভেদ্য লতা

ঝোপ, তাল-খেজুর চারার মাথার ভেতরে, খড় বা টিনের চালার ঘরের চালার তলার বাতা-খুঁটিতে ও অন্যান্য জুতসই স্থানে। ভিমরুলের চাক পারিপ্বার্শিকতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে। নজরে পড়ে না সহজে, তারপরে আবার জায়গা নির্বাচন করে এমন স্থানে যাতে মানুষের চোখের আড়ালে থাকে।

চাক প্রথমে টেনিস বলের মতো গোল হয়। দলে তখন ভিমরুল থাকে গোটাকয়। বংশবৃদ্ধি হয়, চাকও বড়ো হয়। ভয়ংকর মেজাজি আর সাহসী ভিমরুলেরা চাক পাহারায় থাকে সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি ও মুহূর্তেই আক্রমণের লক্ষ্য নিয়ে। এজন্য অজান্তে কোনো মানুষ বা জন্তু যদি এমন দূরত্বে যায় যে, ভিমরুলেরা উপস্থিতি টের পায় অথবা কোনো গবাদি পশু যদি ঝোপটাতে নাড়া দেয়, তাহলে মুহূর্তেই গুঞ্জন তুলে আক্রমণ করে বুলেট গতিতে। এজন্য একজন মানুষ বা পশুর মৃত্যু ঘটে যায়। নাছোড়বান্দা ভিমরুলেরা ছাড়ে না সহজে— পানিতে ঝাঁপ দিলেও না, ডুব দিয়ে থেকে মাথা তুললেই আবারো হুল মারে।

ক্ষ্যাপা মৌমাছিরা এই কাজে আরো বেশি ওস্তাদ। বিন্দু বিন্দু মধু সংগ্রহের জন্য একটি মৌমাছিকে কত শত ফুলে ফুলে যে ঘুরতে হয়! সেই বিন্দু বিন্দু মধু জমেই তো মৌচাকে মধু জমে ২-১২ কেজি (এটি কান্দি মৌচাকের বেলায়। কান্দি হয় গাছের ডালে, ঝুলে থাকে চওড়া হয়ে, দালানের কার্নিসে বা সানসেডের তলায়ও হয়)। সুন্দরবনে কান্দি মৌচাক হয় কয়েক হাজার। প্রতি বছর চৈত্র মাসে বনবিভাগের পাস নিয়ে শত শত মৌয়াল মৌচাক কাটতে ঢোকে সুন্দরবনে। সুন্দরবনে ঢুকে মৌয়ালরা কান্দি মৌচাকই কাটে, মশালের ধোঁয়া দিয়ে চাক থেকে মৌমাছি সরায় আগে। সুন্দরবনে মধুর মৌসুম চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। প্রতি মৌসুমে ১০০ টন মধু সংগৃহীত হয় সুন্দরবন থেকে। মৌমাছিরা তাই কষ্টের মধু নষ্টের জন্যই ডুব দেয়া মানুষকে ছাড়তে চায় না সহজে।

ভিমরুলের কামড়ে তথা হুল খেয়ে বাংলাদেশে প্রতিবছর কত মানুষ মারা যায়— মারা যায় গবাদি পশু, তার কোনো বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যান আছে কিনা, তা আমার জানা নেই। তবে, টানা ৪০ বছর যাবৎ সংবাদপত্র পড়ে আমার ব্যক্তিগত যে পরিসংখ্যান, তাতেও সংখ্যা কম জন। গবাদিপশু ও বন্যপ্রাণীর বেলায় এ ধরনের মৃত্যুর খবর ছাপা হয় কী! না হলেও, আমার শৈশব-বাল্য ও কৈশোর-তরুণবেলার দেখা অভিজ্ঞতায় জানি— গবাদিপশু ও বন্যপ্রাণীও মারা পড়ে ভিমরুলের হুল খেয়ে। সে প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি।

ভিমরুলের হুল মানুষ ও গবাদি পশুরা প্রায় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্দোষভাবে। অর্থাৎ, তাদের জানা থাকে না ভিমরুলের চাক আছে ওখানে। ভিমরুলেরা তো আর তা বোঝে না। শত্রু ভেবেই আক্রমণে আসে। তবে, দুষ্টু শিশু-কিশোরদের ভেতর একটা প্রবল প্রবণতা থাকে যে, চাক দেখলেই দূরে দাঁড়িয়ে ঢিল ছোঁড়ে, গুলতি মারে। ওরা বোঝে না, কী ভয়ংকর মজার খেলায় মেতেছে ওরা! পরিণামে প্রায়ই দুর্ভোগ পোহাতে হয় হুল খেয়ে।

না জেনে যে ভিমরুলের হুল খেয়ে মৃত্যু হয়, তার আরো দুটি উদাহরণ আমি দিচ্ছি-

২০১৬ সালের আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে বিজয় হোসেন (১০) নামক এক বালক ধানক্ষেতে মাছ ধরার সময় মাটিতে পড়ে থাকা একটি তালপাতায় যেই না দিয়েছিল নাড়া, অমনি পাতার তলায় থাকা চাকের ভিমরুলেরা হুল ফুটিয়ে তাকে মেরে ফেলেছিল। ছেলেটির বাড়ি ছিল নওগাঁ জেলার করজ গ্রাম বা কাওয়া ব্যাঙ্গা পাড়ায়। মোটামুটি একই সময়ে বরিশালের গৌরনদী উপজেলার প্রথম শ্রেণি পড়ুয়া স্কুল ছাত্র সাকিবুল জমাদ্দার (৬) বাঁশ বাগানে খেলতে গিয়ে ভিমরুলের কামড়ে মারা যায়। এই তো- সেদিন, মিয়াত হোসেন (৬) ৩৫টি ভিমরুলের হুল খেয়ে মারা যায় (৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮)। তার বাড়ি ছিল সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার খোদ শিয়ালকোটে। এভাবে প্রতি বছর ভিমরুলের হুলে যতজন মারা যায়, তার সব খবর জানা যায় না। এই যে শিশুদের মর্মান্তিক মৃত্যু, এটা বোধহয় রোধ করা বা কমিয়ে আনা সম্ভব অভিভাবক তথা পাড়া প্রতিবেশীর সতর্কতায়। কেননা, যতই গোপন জায়গায় চাক বানাক না ভিমরুলেরা, বয়সিরা তা টের পাবেন ভিমরুলের ঘনঘন যাতায়াত দেখে। শিশু-কিশোরদের সতর্ক করতে হবে- যেন কৌতূহল বশত বা মজার খেলায় মেতে ঢিল না ছোঁড়ে। শিশু-কিশোরদের প্রবণতাই হলো- ভিমরুল-বোলতা ও মৌচাকে ঢিল বা গুলতি মারা। প্রয়োজনে রাতে চাক পুড়িয়ে দিতে হবে বা ভেঙে দিতে হবে। ভেঙে দিলেও বেঁচে থাকা ভিমরুলেরা আবারো ওখানে জড় হয়ে

ভিমরুলের চাকের ছোটো শৈল্পিক প্রবেশপথ

চাক করতে পারে। তাই কেরোসিন ছিটাতে হবে। আমার বাল্য-কৈশোরে আমাদের বাড়ির স্থায়ী গৃহকর্মী (বাড়ি ছিল বর্তমান মঠবাড়িয়া জেলায়। দুঃসাহসী ও শক্তিশালী-নির্ভীক ছিলেন তিনি) ঘরের চালা-বেড়া, কুটোর পালার তলা বা বড়ো গাছের গোড়ায় ভিমরুলের চাক হলে রাতে গিয়ে কৌশলে পুরো চাক চটের বস্তায় ভরে ফেলতেন। তারপরে পুকুর-দিঘির জলে চুবিয়ে খালি পায়েই পাড়িয়ে-মাড়িয়ে ও কাদায় ডুবিয়ে ভিমরুলদের মেরে ফেলতেন। আমার শৈশব-কৈশোর ও তরুণ বেলা পর্যন্ত উনি আমাদের গ্রামের কমপক্ষে দুইশত ভিমরুলের চাক এভাবে বস্তাবন্দি করেছিলেন।

শৈশবে আমি ও আমার খেলার সাথিরা মিলে ভিমরুলের চাকে ঢিল মেরে– দে দৌড়! হুল খেয়েছি আমি কমপক্ষে ২২ কিস্তিতে ৬০টি। তবুও দমে যাইনি। বোলতা ও মৌমাছির হুল বহুবার খেয়েছি আমরা। মৌমাছির হুল খেয়ে কতবার যে আমরা পুকুর-দিঘির জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুব দিয়েছি! তবুও শৈশব ও কিশোর সুলভতায় ঢিল আমরা মেরেই গেছি প্রতি সিজনে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যে, ভিমরুল ও বোলতার হুল মানুষের চামড়ায় থেকে যায় না (কৃচিৎ কোনো কারণ ছাড়া), হুল ওরা বিঁধিয়ে দিয়ে তুলে নেয় আবার, থেকে যায় কেবল মৌমাছিদের হুল।

গ্রামবাংলায় প্রচলিত ধারণা আছে যে, হুল ফুটানো মৌমাছি আর বাঁচে না। ভিমরুল-বোলতারা এক হুল বার বার ব্যবহার করতে পারে। ভিমরুলের হুল স্যালাইন পুশ করার সুঁইয়ের মতো মোটা। মানুষ বা গবাদি পশু অথবা বন্যজন্তুর শরীরে পুশ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যে, শরীরে ঢুকেছে প্রচণ্ড গরম সুচ, পুশ্ করা স্থানটা অবশ হয়ে যায়—ফুলে যায় দ্রুত। প্রাথমিক চিকিৎসা হলো, গোবর, পিঁয়াজের রস, মধু, চিনির পানি, চুন ইত্যাদি লাগাতে হবে। কৃচিৎ কোনো কারণে যদি ২/১ টি হুল খুলে রয়ে যায়, তাৎক্ষণিকভাবে তা তুলে ফেলতে হবে, না হলে দ্রুত বেশি ফুলতে থাকবে ও যন্ত্রণা-অবশতা ছড়িয়ে পড়বে। বিষক্রিয়াও বেশি হবে। তারপরে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

শৈশব-কৈশোরে অবশ্য আমার ক'বন্ধু তথা খেলার সাথি (ছেলে ও মেয়ে। প্রায় সবাই বেঁচে আছে আজও) ভিমরুলের ৪/৫টি হুল খেয়ে বেহুশ হয়ে গেছে, ওই টোটকা চিকিৎসাতেই ২/৪ দিনে সুস্থ হয়ে গেছে। আমি নিজে কখনো এক সঙ্গে ২টি ভিমরুল, ৫টি বোলতা ও ১১টি মৌমাছির হুলের বেশি খাইনি। এই তিন রকমের হুল ফুটানো পোকাদের প্রবণতাই থাকে এমন যে, মানুষের শরীরের নরম স্থানে হুল মারবে। এজন্য আমাদের কান ফুলে পানপিঠা হতো, কপাল ফুলে গোল আলু। তা-ও কী থেমে গিয়েছিলাম আমরা?

চাকে ঢুকবে ভিমরুলটি

না,থামিনি, দমিনি। আমার বাল্য-কৈশোরে আমাদের এলাকায় তিন প্রজাতির বোলতা, দু-প্রজাতির মৌমাছি ও ভিমরুলের চাক হতো প্রচুর, (এই সেপ্টেম্বরেও গ্রামে ভিমরুলের চাক আছে ১৩ খানা) কীভাবে থেমে যাই আমরা? গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, টিভি নেই, পাকা রাস্তা নেই— বাগান আর বাগান! ঝোপঝাড়! সাপখোপ! মাঠ-বাগানে কত প্রজাতির বুনোফল! পাখি! বন্যপ্রাণী! কী আর করতাম আমরা ওই বয়সে!

ভিমরুলের চাক— স্থান বুঝে বিভিন্ন আকৃতির হয়। এটি ৫০ ফুট উচ্চতা থেকে শুরু করে একেবারে মাটি ছুঁই ছুঁই জায়গায়ও (ঝোপঝাড় বেষ্টিত মোটা গাছের গোড়ায়) চাক গড়ে। গত বছর গ্রামের এক শৈশব-বন্ধু সিদ্দিকের বাড়ির উঠোনের আমগাছের ডগার দু-তিনটি ডাল ঘিরে ভিমরুলের যে চাকখানা হয়েছিল, সেটার বেড় ছিল ৫ ফুটেরও বেশি। গ্রামের শাহজাহান মল্লিকের চিংড়ির ঘেরের পাশে বেতের ধামার মতো চাক এখনও বর্তমান (সেপ্টেম্বর-২০১৮)। ওই চাকে আগুন দিতে ভয় পাচ্ছে সে। অবশ্য আগুনে ভিমরুলের চাক চমৎকার পোড়ে। হয়তবা দাহ্য কোনো পদার্থ থাকে চাকের উপকরণে। ওই চাকের কাছে গিয়ে গত ১৮ই আগস্ট ভিমরুলের হুল খেয়ে বেহুশ নাপিত পঙ্কজ শীল হাসপাতালে ছিল ১৫ দিন। ভিমরুলের চাক বানানোর মূল উপকরণগুলো হলো শুকনো গোবর, পচা উদ্ভিদ, (পাতা-শিকড় ইত্যাদি) কলাগাছের পচা ছাল, ছোটো ঘাস-লতা ইত্যাদি। এরা সবাই মস্ত বড়ো এক আর্কিটেক্ট। এদের চাক গড়ার প্লান দেখলে হতবাক হতেই হবে। চাকের ভেতরের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ এমন প্লানে বানানো যে, প্রতিটি প্রকোষ্ঠে ডিম পূর্ণাঙ্গ হবার পরে যেন ভিমরুলের বাচ্চাটি ওই খোপে বা প্রকোষ্ঠে ভালোভাবে স্থান সংকুলান করে থাকতে পারে। সবগুলো আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠের সঙ্গে সদর দরজার (প্রবেশ পথ) লিংক থাকে। চাক ভেঙে ভেতরটা দেখলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। যেন মাটির তলার কোনো সুপরিকল্পিত ক্যান্টনমেন্ট— যেখানে সবাই আইন-শৃঙ্খলা তথা নিয়ম-কানুন মেনে চলে অক্ষরে অক্ষরে। ভিমরুলের ওই ক্যান্টনমেন্টের সদর গেটের (অন্য কোনো গেট তো আর থাকে না) সামনে 'হুলাস্ত্র' নিয়ে সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকে ৩/৪ জন সৈনিক। যদি বিপদের গন্ধ পায়, মুহূর্তেই ভয়ংকর শব্দ তোলে— দু-পাখায় ঘর্ষণ দিয়ে সতর্ক সংকেত পাঠায় অন্দরে, তারপরে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের ভেতরে 'ভুম— ভুউ..উ..ম' আতঙ্কজনক শব্দ তুলে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে অন্যরা, যদি কিনা গার্ডরা সেরকম বিপদ সংকেত অন্দরে পাঠায়। তারপরেই হামলে পড়ে শত্রুর উপরে।

চাকের আকার বুঝে ভিমরুলের সংখ্যার তারতম্য ঘটে। ছোটো চাকে কম পোকা, বড়ো চাকে বেশি পোকা। তবে ২০০-৪০০ পোকা থাকে বড়ো চাকে। ভিমরুলের চাকের ওজন খুবই কম। এটি দেখতে শুকনো গোবরের রঙের মতো, তাতে, মেটে-হলুদ ডোরা ডোরা খোপ খোপ ছোপ থাকে। চাকের বাইরের

দিকটা কিছুটা ঢেউ খেলানো। চাকের উপরিভাগ, তথা ছাদটা সম্পূর্ণ ওয়াটার প্রুফ— মনে হয় মোমের পালিশ করা। বৃষ্টির জল ভেতরে ঢুকতে পারে না। সম্ভবত মুখের লালার সঙ্গে অন্য কিছু মিশিয়ে প্রলেপ দেয় ভিমরুলেরা। এক নজরে মনে হতে পারে সাদা মাটি দিয়ে তৈরি ভিমরুল দুর্গ।

ভিমরুলের প্রধান খাদ্য তালের রস- খেজুর রস- তাল-খেজুরের গুড়, পাকা ফল— যেমন, আম-কলা-পেঁপে-আতা ইত্যাদি। তবে, ফল নিজেরা ছিদ্র করতে পারে না। ফলখেকো পাখিরা ছিদ্র করার পরে ভিমরুলেরা খেতে পারে। পাকা তাল-খেজুরও খায়। ভিমরুল দেখতে— এক নজরে খয়েরি বা গাঢ় খয়েরি। বয়স বাড়লে পেছন দিকটা ও মাথার দিকটা কালো হয়। কালো ভোমরা পোকা আর ভিমরুলকে একই ভেবে থাকেন অনেকে। তবে, দুটি আলাদা পোকা। ভিমরুলের ইংরেজি নাম Hornet. সারা বাংলাদেশেই আছে এরা।

বড়ো মৌমাছিরা (ইংরেজি নাম Honey Bee.) গাছের ডালে, ঘরের চালার নিচের বাতা ও দালানের কার্নিশের তলায় মস্ত বড়ো চাক বানায়— যাকে বলে 'কান্দি মৌচাক'। এই মৌচাক হতে পারে অর্ধবৃত্তাকার— বৃত্ত থাকে নিচের দিকে, হতে পারে ইংরেজি 'ইউ' অথবা 'ভি' আকৃতিরও। ঢাকা শহরেও এই মৌচাক নজরে পড়ে। পাশাপাশি ২-৬ খানা চাকও দেখা যায়। গ্রামবাংলায় আজও যথেষ্ট সংখ্যক নজরে পড়ে— বিশেষ করে সুন্দরবন সংলগ্ন জেলাগুলোর গ্রামে। সুন্দরবনে তো— শত শত মৌচাক হয়।

এই মৌমাছি আকারে কিছুটা বড়ো— ছোটো মৌমাছির তুলনায়। ছোটো মৌমাছিরা চাক গড়ে গাছের খোঁড়লে-কোটরে, সুযোগ পেলে গাছের গোড়ার মাটির গর্তে। মাঘের শেষে গ্রামবাংলার বহু শিশু-কিশোর ও বয়েসিরা বাড়ির ভেতরের গাছগুলোতে কাত্ করে ঠিলা-কলস বেঁধে রাখতো (আমরাও বহু বেঁধেছি), ভেতরে একটু গুড়ও মেখে রাখা হতো। ওর ভেতরেও ছোটো মৌমাছিরা চাক বানাতো, সেই চাকে মধু জমাতো। খোঁড়লে-কোটরে চাক করার জন্য ওদের বলা হয় 'খুড়ুল্লে বা কোটরে মৌমাছি'। ওরা আলাদা আলাদা ভাবে ৫-৮টি চাক বানায়। প্রতিটি চাক দেখতে অনেকটাই চিতাপিঠার মতো (পিঠার চেয়ে কম চওড়া)। ঠিলা-কলসি পেতে রাখার পরে আপদ হয়ে দেখা দিত দোয়েল-শালিক কোটরে পেঁচা ইত্যাদি কোটরবাসী পাখিদের বাসা বানানোর প্রয়াস। প্রতিদিনই খড়কুটো সাফ করতে হতো।

তুলসি পাতা চিবিয়ে ভেতরে ফুঁ দিয়ে মৌমাছি সরাতে হতো আগে, তারপরে সাবধানে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মধুভরা চাক বের করতে হতো টেনে। দু-পাঁচটা হুল তো খেতেই হবে। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে 'মধু মন্তর' বা 'মৌ-মন্ত্র' জানা ফকির-সাধু টাইপের মানুষ পাওয়া যেত। ওরা নাকি এমন মন্ত্র জানত যে, মৌমাছির হুল খসে পড়ত। অতএব, হুল ফুটাতে পারত না। যাহোক খুড়ুল্লে চাকের ভেতরে প্রয়োজনে ধোঁয়া দেয়া হতো যা আজও হয়, খোঁড়ল-কোটরের মুখ ছোটো হলে ভেতরে তো হাত ঢুকত না, সেক্ষেত্রে দা বা ছোটো হাত কুড়োল দিয়ে মুখ কেটে বড়ো করতে হতো।

এই দুই জাতের মৌমাছিই শান্ত ও নিরীহ। তবে, ক্ষেপে গেলে এদের আর হুঁশ জ্ঞান থাকে না। ক্ষেপে পাগলা হয়ে যায়। বিশেষ করে 'কান্দি মৌচাক' বা বড়ো মৌমাছিদের চাকে ঢিল মারলে, সেই ঢিল লাগলে ওরা মহা গুঞ্জন-গান শুনিয়ে সেকেন্ডে উড়ে এসে ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ করে, তাড়া করে— পুকুর-দিঘি বা নদী-খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব দিয়েও রক্ষা মেলে না। ওরা জানে, ডুব যে দিয়েছে, মাথা তাকে জাগাতেই হবে। মাথা জাগালেই আবার শুরু। তবে, এই দুরকম মৌমাছির দুর্বলতা হলো— একবার হুল বসালে সেই হুল খসে মানুষের শরীরে রয়ে যায়— ওই মৌমাছিটি পরবর্তীতে নাকি মারা যায়। এজন্য, যারা একবার হুল মারে তারা সরে যায়। আসে নতুন মৌমাছিরা। ভিমরুল ও বোলতার হুল খসে না।

মৌমাছির কামড়েও আমাদের দেশে প্রতি মৌসুমে অনেক মানুষ মারা যায়। ১৯৭৯ সালে আমার গ্রামের সামাদ শেখ ওরফে ছুট্টে শেখ নামক এক বৃদ্ধ তাঁর গোয়ালের গরুর পাল নিয়ে যাচ্ছিলেন মাঠের দিকে। পথের ওপরের আমগাছের ডালে ছিল মৌচাক। প্রতিদিনই তিনি ঐ গাছের তলা দিয়ে যাতায়াত করেন, জানেন মৌচাকের কথা। কিন্তু সেদিন তার ভাগ্য এমনই ছিল যে, তিনি ঠিক যখন মৌচাকের তলা অতিক্রম করছেন, তখনি একটি মধুখেকো মধুবাজ (হানি বাজ, এরা মধু পান করতে খুবই ভালোবাসে। দূর থেকে উড়ে এসে শাঁ করে মৌচাকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় পা চালিয়ে চাকের একটা অংশ

ভেঙে দিয়ে যায়, খণ্ডিত চাক গাছতলায় পড়ে, ৪০ মিনিট থেকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ক্ষ্যাপা মৌমাছিরা যখন শান্ত হয়, তখন গেরিলা কৌশলে মাটিতে নামে মধুবাজ। হয় ওখানে বসেই মধু পান করে অথবা মৌমাছির ডিম-বাচ্চা খায়, নাহলে দু-নখরে ধরে উড়ে গিয়ে কোনো গাছে বসে) হামলা করে মৌচাকে, ভেঙে যাওয়া অংশ পড়ে শেখের মাথায়। মুহূর্তেই মৃত্যু ঘটে তার। ওই দিন কাছাকাছি থাকা এক প্রতিবেশীর দু-টি ছাগল মারা পড়েছিল, একটি 'ভ্যা ভ্যা' ডেকে দৌড়ে পালাতে পেরেছিল। অন্যটি তখন বেঁচে থাকলেও দিন কয়েকের ভেতর ছাগলটির শরীরের সব লোম ঝরে পড়েছিল। এপ্রিল (২০১৮) মাসে আমার এক হাইস্কুল বন্ধু মোজাফফর (কাঁঠালতলা, ফকিরহাট, বাগেরহাট) বাইসাইকেলে হাটে যাবার পথে পড়েছিল ওই মৌবাজের ফাঁদে, মৌচাকওয়ালা একটি গাছের তলা অতিক্রম করার সময় হামলা করে মধুবাজটি। অসংখ্য হুল খেয়ে মোজাফফর গাছতলাতেই বেহুঁশ হয়। পরে খুলনার একটি হাসপাতালে নেবার পথে সে মারা যায়।

আমি অবশ্য একবার কান-ঘাড়-মাথা-কপাল ও নাক-মুখে মোট ১১টি হুল খেয়েছিলাম বড়ো মৌমাছির। দোষ তো আর মৌমাছির না, আমাদেরই। ঢিল মেরে চাকের খণ্ডাংশ ভেঙে দেবার পরে তেড়ে আসে মৌমাছিরা। আমরা ৭ জন পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে দে ডুব। তারপরে পানির তলা দিয়ে ওপারে। তা-ও আমি ১১টি হুল খেলাম। অন্যরা গড়ে ৫টি করে। আমাদের তিনজনের জ্বর এসেছিল। লিকলিকে আমার মাথা-কপাল-ঘাড় ফুলে স্বাস্থ্যবান হয়ে গিয়েছিলাম। মাথা ভোঁ ভোঁ। কান শোঁ শোঁ। চোখে দিবাতারা বা সর্ষেফুল। অবশ্য চোখ ফুলে সাময়িক অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শয্যাশায়ী ছিলাম ৫ দিন। মা-নানি-চাচি ও দাদিরা আমার শরীর চেক করে হুল তুলে ফেলেছিলেন। ভিমরুলে কামড়ালে যা যা টোটকা করতে হয়, সব করেছিলেন। মৌমাছির ক্ষেত্রেও টোটকা চিকিৎসা পদ্ধতি একই। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে পুবমুখো আর পশ্চিমমুখো কান্দি মৌচাকের মৌমাছিরা গরমে এমনিতেই সর্বক্ষণ রেগে তেতে থাকে। কেননা, সকালের সূর্য সেই প্রায় দুপুর অবধি সরাসরি চাকে লাগে, দুপুরের পর থেকে গোধূলি পর্যন্ত সূর্য তাকিয়ে থাকে পশ্চিমমুখো চাকের দিকে। একে বলা হয় 'সূর্যমুখি মৌচাক'। এরা বেশি ক্ষ্যাপাটে হয়।

আবার, বসন্তে দেখা যায় রানি মৌমাচিকে কেন্দ্র করে শত শত মৌমাছি ঘন হয়ে উড়তে উড়তে ঘুরতে ঘুরতে কালো ধোঁয়ার বলের মতো এগিয়ে চলেছে কোথাও। মৌমাছিদের সম্মিলিত গান (পাখা ঘর্ষণের শব্দ) শোনা যাচ্ছে বহুদূর থেকে। তখন দেখেছি, মা-চাচি-দাদি-নানিরা দৌড়ে গিয়ে ঢেঁকিতে 'পার' দিচ্ছেন। কথায় আছে– 'ঢেঁকির পাড়ের শব্দ ৭ বাড়ি কাঁপায়'। ওই কম্পনে ভয় পেয়ে তড়িঘড়ি মৌমাছির ঝাঁক গাছের ডালে বসে যেত। এদেরকে বলা হয় 'জিরেন পোকা' বা 'জিরেন মৌমাছি'। ওরা তো আসলে বেরিয়েছিল মৌচাক গড়ার জুৎসই জায়গা খুঁজতে। ভয় পেয়েই না বসে গেল! সবাই আশা করত– তার বাড়ির গাছেই বসুক মৌমাছি। তাহলে খাওয়া যাবে মধু। কিন্তু ওরাতো প্রায় ক্ষেত্রে ২-৪ দিন বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ত আবারো। আসলে ভিমরুল-মৌমাছি ও বোলতাদের জীবনচক্র রহস্যময় ও রূপকথার মতোই সুন্দর।

ভিমরুল-মৌমাছি ও বোলতা আমাদের দেশের মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। যা যা এতক্ষণ বললাম আমি নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে, তার চেয়ে বহুগুণে অভিজ্ঞ মানুষ সারা বাংলাদেশেই মিলবে। শিশু-কিশোররাও সব জানে ও দেখেছে। তারা জানে ভিমরুল-বোলতা ও মৌমাছির ডিম-বাচ্চা মাছেদের জন্য লোভনীয় টোপ। তারা জানে তিন রকমের বোলতার কথাও। বড়ো হলুদ বোলতা, (বোলতার ইংরেজি নাম Wasp) মাঝারি বোলতা ও খুদে বোলতা। দেখেছে ওদের চাকও। মৌমাছি ও বোলতারাও যে আর্কিটেক্ট, তা-ও বোঝে তারা। বোলতার খাদ্য তালিকা ও চাক বানানোর উপকরণ ভিমরুলের মতোই। বড়ো হলুদ বোলতার চাক দেখতে হয় অনেকটাই উলটো করে ধরে রাখা ছোটো কলমি ফুলের মতো বা উলটো করে ধরা বড়োসড়ো গোলাপ ফুলের মতো। ফুলের বোঁটার মতো চাকেরও বোঁটা থাকে। একই আকৃতির

হলুদ বোলতার চাক

মাধারি বোলতার চাক

প্রকোষ্ঠ বা খোপগুলো লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চির মতো হয়। খোপের গড়ন পঞ্চভূজের মতো। এতে প্রকোষ্ঠ বা কোটর থাকে ২০০টি পর্যন্ত। ছোটো চাকে প্রকোষ্ঠ কম থাকে। এদের বাসার ছাদও ওয়াটার প্রুফ, হাত দিলে কাগজ কাগজ মনে হয়, তৈলাক্ত ভাব থাকে। ছাদ শক্ত, খোপগুলো ও বেষ্টনীগুলো নরম। ওজনে এচাক একেবারেই হালকা।

খুদে বোলতা দেখতে মাছির মতো, তবে মাছির চেয়ে একটু সরু ও লম্বাটে। ৩ রকমের বোলতা ও ২ রকমের মৌ-মাছিদেরও সার্বক্ষণিক প্রহরী থাকে ৩-৫ জন। মৌমাছি-ভিমরুল ও বোলতা নিয়ে গ্রামবাংলায় এত এত মজাদার ঘটনা জমা আছে যে, তা জড় করে বই প্রকাশ করলে 'মৌমাছি মহা গদ্য-গল্প' হয়ে যাবে।

বোলতা ও ভিমরুলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একটি প্রচলিত গল্প এরকম যে, সুন্দরবনের বানরেরা নদীর পাড়ে গিয়ে পুরু করে আচ্ছামতো মাথা, লেজ ও পুরো শরীরে কাদা মেখে রোদে বসে শুকিয়ে নেবার পরে গাছে চড়ে চোখ বুঁজে হাত দিয়ে বড়ো বড়ো মৌচাক ভেঙে দূরে গিয়ে মজা করে মধু খায়। মৌয়াল-জেলে ও বাওয়ালিদের কাছেও আমি এরকমটি শুনেছি।

এ প্রসঙ্গে কুমোরে পোকা বা কুমোর পোকার কথাও বলা যায়। কুমোররা যেমন মাটির হাঁড়ি-কলসি বানায় জল-মাটি ছেনে, কুমোরে পোকারাও জল-মাটি এক করে চমৎকার মাটির গোলগাল বা লম্বাটে বাসা বানায়। প্রবেশ মুখ একটাই থাকে। এরা মানুষের ঘরবাড়িতেই মাটির বাড়ি বানায়। জোড়ায় জোড়ায় থাকে। মাটিতে নেমে নিজের চেয়েও ঘুগ্‌রো পোকার মতো বড়ো পোকা শিকার করে বাসায় আনে বা বাইরে বসে খায়। এরকম দৃশ্যও গ্রামবাংলার মানুষ হরহামেশা দেখে থাকেন আজও।

শেষ করার আগে দুটো মজার অভিজ্ঞতার কথা বলছি। মৌমাছির আক্রমণে পড়লে বাদামি কাঠবিড়ালিরা লোমশ শরীরটা ফুলিয়ে আর লোমশ লেজটা বুক-পেট হয়ে বাড়িয়ে দিয়ে লেজের আগার গুচ্ছের ভেতরে মুখ গুজে বসে থাকে চুপচাপ। মৌমাছিরা ওদের কিছুই করতে পারে না।

১৯৬৭ সালে আমাদের বাড়ির উঠোনের কোণে জামের ডালে বড়োসড়ো কান্দি মৌচাকখানা ভাঙা ছিল অসম্ভব। একে তো মগডালের কাছে, তার উপরে কালো জামের ডালের গোড়া হয় খুব নরম। চাপ খেলে ডালের গোড়া খসে যায়। মৌচাক কাটা হয় চাঁদের নবমী থেকে ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত। না হলে চাকে মধু খুবই কম মেলে। কেননা, অমাবশ্যা-পূর্ণিমায় মৌমাছিরা বিশ্রাম নেয় ও চাকের মধু পান করে। আমার বাবা তাই এক সকালে চাকের সোজাসুজি মাটিতে ভেজা কুটোর একটা বড়ো বৃত্ত তৈরি করলেন। তাতে ছিটানো হলো কেরোসিন। একটু দূরে টানানো হলো মশারি। নতুন মশারি মাপ মতো ছিদ্র করে তার ভেতর থেকে বন্দুকের নল বের করে বাবা বসলেন মশারির ভেতরে। আমরা মশারির চারপাশটা ভালোভাবে ইটচাপা দিয়ে ঘরে গিয়ে দরজা দিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। মা কুটোয় অগ্নিসংযোগ করে রান্নাঘরে ঢুকে দরজা দিলেন। বৃত্তের ভেতরে কলাপাতার বিছানা পাতা ছিল। এল.জি কার্তুজে বাবা ৩ বার গুলি করলেন। চাক খসে পড়ল কলাপাতার উপরে। বাবাকে তখন আর দেখা যায় না। ঘিরে ধরেছে মৌমাছিরা। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ক্ষ্যাপা মৌমাছিরা বসল গিয়ে আবার জামের ডালে। বাবা বেরুলেন। কার্তুজের খালি খাপটা যেই না বের করলেন, অমনি বন্দুকের নলের ভেতরে ঢোকা ৫/৬টি মৌমাছি বাবাকে হুল ফুটালো। নলের আগা দিয়েই ওরা ঢুকে পড়েছিল।

লেখক: বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিবেশ লেখক

আলোকচিত্র ঃ আ. ন. ম. আমিনুর রহমান ও শিপলু খান।

আজব কিন্তু গুজব নয়

মেজবাউল হক

পানির নিচের মাকড়সা

বন্ধুরা, মাকড়সা তো চেনোই। আট পায়ে ভর করে চলা, নিখুঁত জালে শিকার ধরায় পটু এ প্রাণীটি অন্যসব পোকামাকড় থেকে একেবারে আলাদা।

কমিক চরিত্র স্পাইডারম্যান- এর বরাতে বিশ্বের সবাই তাকে চেনে। জাল বিছিয়ে বাড়িঘর নোংরা করলেও কিন্তু অপকারী পোকামাকড় খেয়ে সবার উপকার করে মাকড়সা। ঘরের আনাচে-কানাচে, বনে-জঙ্গলে দেখা মাকড়সার খোঁজ মিলে এখন পানির নিচেও। ইউরোপিয়ান ওয়াটার স্পাইডার নামের মাকড়সা ভূমির চেয়ে পানির নিচে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। মাকড়সা প্রজাতির মধ্যে ওয়াটার স্পাইডার হলো ডুবুরি জাতি। মাছের মতো ফুলকা না থাকলেও এই প্রাণীটির শরীরের মাঝখানে আছে বিশেষ অংশ, যেটির নাম বায়ুথলি। এটি থেকে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে এর শরীরে। এরা পানিতে ডুব দেওয়ার আগে বায়ুথলি বাতাসে পূর্ণ করে নেয়। যেভাবে মানুষ ডুবুরিরা সঙ্গে নেয় অক্সিজেনের ট্যাংক। বাতাসে পূর্ণ বায়ুথলি থেকে অক্সিজেন নিয়ে দিব্যি ওয়াটার স্পাইডার ঘুড়ে বেড়ায় পানির নিচে।

বিমান আটকে দিল মৌমাছি

ওড়ার জন্য তৈরি প্লেন। হঠাৎ দেখা দিল বিপত্তি। তবে এই বিপত্তির কারিগরি বা যান্ত্রিক কারণে নয়, মৌমাছি। দক্ষিণ আফ্রিকার কিং শাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সম্প্রতি প্লেনের ইঞ্জিনে মৌমাছি ঢুকে পড়ায় একে একে তিনটি ফ্লাইট ছাড়তে হয় দেরিতে। ডারবানের এই বিমানবন্দরে ম্যাংগো এয়ালাইন্সের প্লেনটি ঠিক ওড়ার মুহূর্তে ইঞ্জিনে মৌমাছি দেখতে পান বিমান ক্রুরা। দ্রুত এসে দুজন ইঞ্জিন থেকে যে মৌমাছি বের করেন তার সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। এ মৌমাছি সরাতে সময় লাগে আধা ঘণ্টা। কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রথমবার এ রকম বিরল অভিজ্ঞতা তাদের জন্য। মৌমাছির ফ্লাইট আটকানোর এই মজার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বে। কি বুঝলে বন্ধুরা! দেখলে তো তোমার চোখের সামনে থাকা মৌমাছির বিশাল কাণ্ড।

পোকামাকড় চুরি

ফিলাডেলফিয়ায় ইনসেক্টারিয়াম ও বাটারফ্লাই প্যাভিলিয়ন–নামের দুটি সংগ্রহশালা থেকে চুরি হয়েছে ৭ হাজার পোকামাকড়। আর এ ঘটনা ঘটে আগস্ট মাসে। প্রায় ৮০ শতাংশ কীটপতঙ্গ ও প্রজাপতি চুরি যাওয়ায় দেশটির তিনতলা সংগ্রহশালাটির দুটি তালাই বন্ধ করে দেওয়া হয়। চুরি যাওয়া জীবন্ত সংগ্রহের দাম প্রায় ৫০ হাজার ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা। এই চুরির কারণ বলতে গিয়ে সংগ্রহশালাটির মালিক জন কেমব্রিজ বলেন, 'পোকামাকড়ের বাজার এখন খুব চাঙা। তাই এ চুরি, ঠিক হাতে না পড়লে এগুলো মারা যাবে। ওই সংগ্রহে এমন কিছু প্রাণী আছে যাদের বিষে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে'। যার কারণে ফিলাডেলফিয়া পুলিশের সঙ্গে এফবিআইও নেমেছে এই ঘটনার তদন্তে।

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

ডানে পোকা বামে পোকা, চারদিকে হাজার হাজার পোকা, গুবরে পোকা, শুঁয়োপোকা, নাম না জানা কিলবিলে পোকা। কী ভয় পাচ্ছ? ভয় নেই। পোকাগুলোর বেশির ভাগই মরা। যেগুলো জীবিত সেগুলো রাখা আছে কাচের বাক্সে। দুনিয়ায় যে কত রকম পোকামাকড়, তা গুণে শেষ করা যাবে না। এক ছাদের তলায় হাজার

হাজার পোকা দেখার মজাই আলাদা। মন্ট্রিয়লের বিশাল বোটানিক্যাল গার্ডেনের এক কোণে রয়েছে এই কীটপতঙ্গ জাদুঘর, ইংরেজিতে যাকে বলে ইনসেক্টেরিয়াম। উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো পোকামাকড় জাদুঘর এটিই।

এ জাদুঘরে রাত ও দিনের পোকা আলাদা বাক্সে রাখা হয়েছে । এগুলো সবই মৃত। বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা। জ্যান্ত পোকাও আছে। সেগুলোকে কাচের বাক্সে উপযুক্ত পরিবেশে রাখা। একদল পোকা গবেষক সর্বদা এদের নজর রাখছেন। প্রতিদিন নিয়ম মেনে দেওয়া হয় ওদের প্রিয় খাবার। মজার শেষ এখানেই নয়। পোকার গান শুনতে চাও? সে ব্যবস্থাও আছে। রেকর্ড করা আছে পোকার ডাক। বোতাম চেপে সে ডাক শুনতে ছোটোদের জটলা লেগেই থাকে।

পোকামাকড়

সুমাইয়া আক্তার

কত রকম পোকামাকড়
আমরা দেখতে পাই
ছোটো বড়ো নানা রঙের
কোনো হিসাব নাই।

দিনের পোকা রাতের পোকা
একটি থেকে একটি আলাদা
ইচ্ছেমতো ডাকে তারা
নেই তো কোনো বাধা।

কেউ থাকে মাটির নিচে
কেউবা গাছের ডালে
এক সাথে থাকে ওরা
ছুটে দলবলে।

দশম শ্রেণি, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

পোকা

আদনান শাহরিয়ার

ঝোপঝাড়ে দেখা মিলে
অনেক রকম পোকা
মজার মজার নামে
হয় যে তাদের ডাকা।

কত কাণ্ড ঘটায় তারা
নিজের ইচ্ছেমতো
পোকা নিয়ে গল্প-কবিতা
আছে শত শত।

তাদের নিয়ে হয় সিনেমা
আছে উপন্যাস
এই পোকারা করে থাকে
নানান জায়গায় বাস।

একাদশ শ্রেণি
কমলাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

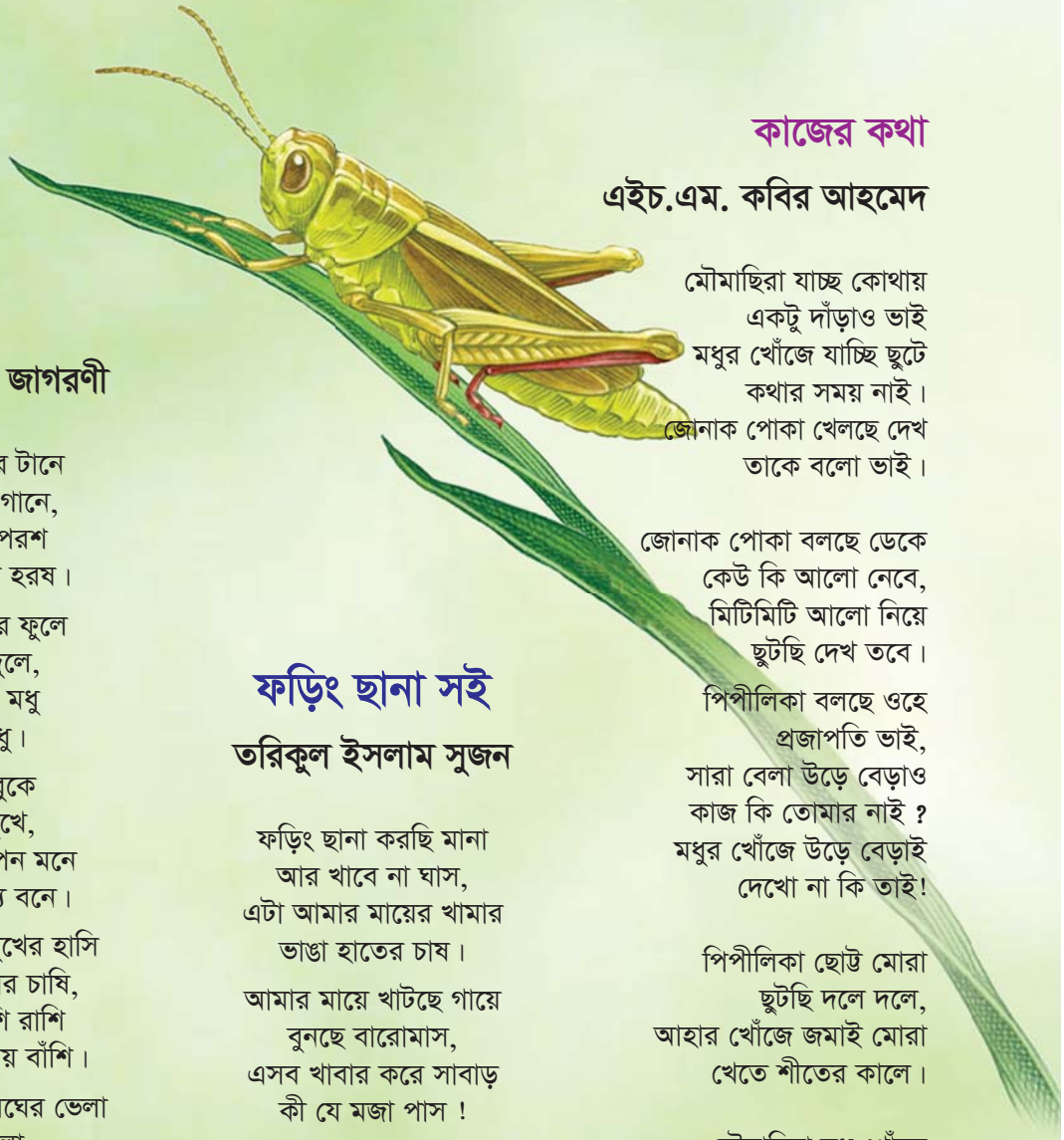

বাংলাদেশ

আব্দুল মালেক জাগরণী

বনের পাখি প্রাণের টানে
ভুবন ভরায় গানে গানে,
নদী যেথা শীতল পরশ
দিয়ে জাগায় হৃদয় হরষ।

জলের বুকে হাজার ফুলে
নৃত্য করে হেলে দুলে,
ভ্রমর যেথা ফুলের মধু
আহরণে ছোটে শুধু।

প্রজাপতি ফুলের বুকে
ছুটে বেড়ায় মহাসুখে,
খেলতে খেলা আপন মনে
বন ভুলে যায় অন্য বনে।

দেখতে খোকার মুখের হাসি
ওই আকাশে তারার চাষি,
ফুল বুনে যায় রাশি রাশি
ঝিঁঝি পোকা বাজায় বাঁশি।

হাওয়ায় দোলে মেঘের ভেলা
লুকোচুরি করে খেলা,
নেই তো নিষেধ নেই তো বাধা
মুক্ত হেথা প্রাণের রাধা।

এমন দেশের নাম শুনতে যারা
উন্মত্ত হৃদয় পাগলপারা,
বলছি তবে শোনো এবার বেশ
সে যে আমার সোনার বাংলাদেশ।

ফড়িং ছানা সই

তরিকুল ইসলাম সুজন

ফড়িং ছানা করছি মানা
আর খাবে না ঘাস,
এটা আমার মায়ের খামার
ভাঙা হাতের চাষ।

আমার মায়ে খাটছে গায়ে
বুনছে বারোমাস,
এসব খাবার করে সাবাড়
কী যে মজা পাস !

দিসনে জ্বালা জলদি পালা
আসছে মায়ে ওই,
বললে মাকে পিটবে কাকে
সাবধান হতে কই।

খামার ছাড়ি আসিস বাড়ি
খেতে দেব দই,
আর না হলে মাকে বলে
পাতব দুজন সই।

কাজের কথা

এইচ.এম. কবির আহমেদ

মৌমাছিরা যাচ্ছ কোথায়
একটু দাঁড়াও ভাই
মধুর খোঁজে যাচ্ছি ছুটে
কথার সময় নাই।
জোনাক পোকা খেলছে দেখ
তাকে বলো ভাই।

জোনাক পোকা বলছে ডেকে
কেউ কি আলো নেবে,
মিটিমিটি আলো নিয়ে
ছুটছি দেখ তবে।

পিপীলিকা বলছে ওহে
প্রজাপতি ভাই,
সারা বেলা উড়ে বেড়াও
কাজ কি তোমার নাই ?
মধুর খোঁজে উড়ে বেড়াই
দেখো না কি তাই!

পিপীলিকা ছোট্ট মোরা
ছুটছি দলে দলে,
আহার খোঁজে জমাই মোরা
খেতে শীতের কালে।

মৌমাছিরা মধু খোঁজে
ঘুরে বনে বনে।
প্রজাপতি মেলে ডানা
ফুলবাগানের ফুলে।
জোনাক জ্বলে মিটিমিটি
বাঁশ-বাগানের কোণে।

যে যার কাজে ছুটছে তারা
কাজেতে নেই হেলা,
আহার খোঁজে বেড়ায় তারা
দিনের সারা বেলা।

জোনাক পোকার আলো

মোরশেদ কমল

আঁধার রাতে বাইরে গেলাম
আমরা ক'জন মিলে
ভয়ের কথা বলি না কেউ
কিন্তু কাঁপে পিলে।

মুখে মুখে সাহস সবার
আঁধারে নাই ভয়
আঁধার রাতে বন পেরুনো
মুখের কথা নয় ।

যেতে যেতে পথের মাঝে
হঠাৎ-ই যাই থেমে
মনের বাঘে করলে তাড়া
যায় যে শরীর ঘেমে।

সবাই যখন ভয় পেয়েছি
রাত্রি যখন কালো
পকেট থেকে বের করলাম
জোনাক পোকার আলো।

প্রজাপতির রং ঢং

লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

প্রজাপতির রং-বেরঙের জামা
দেখেছে তা চাঁদমামা।
প্রজাপতির আছে সুন্দর ডানা
দেখতে নেই মানা।
প্রজাপতির সুন্দর দু'টা পাখা
অনেক রং দিয়ে মাখা
সবার কি হয়েছে তা দেখা?
যখন সে হাসে, ডানাগুলো ভাসে
যখন তার কান্না, ডানাগুলো মেলে না।
কখনো ধরো না তার ডানা, রয়েছে মানা
ছোটোদের অজানা, বড়োদের আছে জানা।
আমার মন চায় তার সাথে বেড়াতে
কিন্তু সে চায় আমাকে এড়াতে
কখন সে বুঝবে মনের ব্যথা
তখন রাখবে আমার কথা।
তবুও নিবো না তোর সাথে আড়ি
আসিস বেড়াতে আমার বাড়ি
করব অনেক যত্ন
দিব অনেক রত্ন।

বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা।

আমার দেশ

মো. আরিফ হোসেন

আমার দেশের বিচিত্রটা
লাগে খুবই বেশ,
রূপের কথা বলব যত
হবে নাতো শেষ ।

মাঠে মাঠে কৃষকেরা
থাকে সারাক্ষণ,
সাধ্যমতো কাজটা করে
দিয়ে তারা মন ।

গাছের ডালে পাখপাখালির
কণ্ঠে শুনি গান,
কিচিরমিচির মধুর ডাকে
জুড়ায় মনোপ্রাণ ।

মৌমাছিরা মধু ছাঁকে
ফুল বাগানে রোজ,
পিপীলিকা দলটা বেঁধে
আহার করে খোঁজ ।

নদীর বুকে জেলে ভাইয়ে
ধরে বড়ো মাছ,
রুই, কাতল ও বোয়াল পেয়ে
মারে শুধু নাচ।

ঘাস ফড়িং

নাসির ফরহাদ

ঘাস ফড়িং, আমাদের ধানক্ষেতে কেন তুমি?

ঘাড় ঘুরিয়ে ড্যাব ড্যাব চোখে তাকাল ফড়িং। কেন এমন করে বলছ বন্ধু? আমরা তো সবখানেই ছুটে বেড়াই। কেউ বারণ করে না। আমরা সবার বন্ধু। তোমাদেরও। তোমাদের সাথে তো এমন কোনো বিরোধ নেই। কোনো ক্ষতি তো করিনি তোমাদের।

কেন? বাবা তো রোজই বলে ফড়িং-এ ধানগুলো খেয়ে ফেলেছে! বাবা মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করে।

ঘাস ফড়িং মুখ নিচু করে বলে, আমরা ইচ্ছে করে কারো ক্ষতি করি না।

ছোটো অয়ন ফড়িংয়ের সব কথা শুনে বাবার কাছে দৌড়ে গেল। জানতে চাইল ঘাস ফড়িং আমাদের ক্ষতি করেছে কি না।

বাবা অয়নের কথা শুনে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। হেসে বলল, ঘাস ফড়িং আমাদের তেমন ক্ষতি করে না। তবে মাজরা পোকাটা খুব বাজে। ধান লাগানোর সময় থেকে বিরক্ত করছে। মাজরায় খাওয়া ধানগুলো শুকিয়ে যায়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে কিন্তু খেতে পারে না।

বাবার কথা শুনে অয়ন আবার ফড়িং-এর কাছে দৌড়ে যায়। ফড়িংটা অয়নকে যেতে দেখে গা ঢাকা দিলো। মারতে পারে সেই ভয়ে। অয়ন চারপাশে তাকিয়েও দেখা পায় না ফড়িংটাকে। ডেকে ডেকে বলছে, ঘাস ফড়িং তুমি খুব ভালো। বাবা বলেছে। কাছে আসো বন্ধু, দেখা দাও। তোমায় মারতে আসিনি।

তখন টুম টুম পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসলো, কে?

কে আবার?

ঘাস ফড়িংটা!

ঘাস ফড়িং ফসলের ক্ষতি করে কি না, জানতে পারবে এই গল্পটায়। জানার পর এই সুন্দর ঘাস ফড়িংকে রং করে দিও, কেমন?

নিবন্ধ

লেডি বার্ড বিটল

প্রফেসর আবু হেনা মুস্তফা কামাল

পোকা শব্দটি শুনলেই সাধারণত আমাদের মনে একটি নেতিবাচক ধারণার উদ্রেক হয়-তা হলো পোকা আমাদের জন্য ক্ষতিকর এবং একে মেরে ফেলাই উত্তম। কিন্তু আসলেই কি তাই? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নয়। অনেক পোকাই আছে যারা আমাদের জন্য উপকারী। তেমনি একটি উপকারী পোকার কথাই আমরা জানব আর তা হলো লেডি বার্ড বিটল।

নামটি শুনেই চমৎকার লাগছে। এর নামকরণের কিন্তু ছোটো ইতিহাস আছে। মেরি বা our lady-র প্রথম দিককার চিত্রকর্মে দেখা যেত মেরি লাল আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় আছে এবং তাতে সাতটি দাগ থাকত যা দ্বারা সাতটি আনন্দ বা সাতটি দুঃখকে বুঝানো হতো। তখন থেকে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা এই পোকাটির নাম দেন লেডি বার্ড বিটল। কারণ অধিকাংশ লেডি বার্ডের গায়ে ৭টি গোলাকার ছোপ ছোপ দাগ থাকে এবং ব্রিটেনে প্রাপ্ত প্রজাতিটির গায়ের রং লাল। কখনো কখনো একে মেরি বিটলও বলা হয়। তবে উত্তর আমেরিকায় একে লেডি বার্ড নামে ডাকা হয়।

পৃথিবীতে প্রায় ৫০০০ বা তারও কিছু বেশি প্রজাতির লেডি বার্ড আছে। এটি মানুষের অনেক পছন্দের একটি পতঙ্গ। প্রাণিজগতে এদের অবস্থান আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) পর্বের ইনসেক্টা (Insecta) শ্রেণির কলিওপটেরা (Coleoptera) বর্গে। এই বর্গের পতঙ্গদের ২ জোড়া ডানা এবং ৩ জোড়া ছোটো ছোটো পা থাকে এবং অধিকাংশ পতঙ্গের গায়ে ছোপ ছোপ দাগ থাকে। এদের গোত্রের (Family) নাম হলো কক্সিনেলিডি (coccinellidae)। এই গোত্রের অধিকাংশ সদস্যই আকর্ষণীয় বর্ণের হয়ে থাকে। এখানে পোকাটির বর্ণনায়

পর্ব, শ্রেণি, বর্গ ও গোত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আসলে শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপ বা ক্যাটাগরি, কোনো একটি প্রাণীকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করতে হলে তার শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থানের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করতে হয়। এই ধাপগুলোর ক্রম হলো- পর্ব, শ্রেণি, বর্গ, গোত্র, গণ, প্রজাতি। লেডি বার্ড বিটলও অনেক বর্ণের হয়ে থাকে। যেমন লাল, কমলা, হলুদ ইত্যাদি। এদের দেহ সাধারণত ডিম্বাকার এবং ডোম আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে। দেহের আকার ০.৮ - ১৮ মিমি. পর্যন্ত। এদের দেহে ছোপ ছোপ গোলাকার দাগ বা বিভিন্ন রেখা থাকতে পারে। আবার কোনোটির গায়ে কোনো প্রকার দাগ নাও থাকতে পারে। এদের মস্তক কালো বর্ণের কিন্তু দুপাশে সাদা বর্ণের বিশেষ দাগ বা খাঁজ থাকে।

লেডি বার্ড বিটল সাধারণত carnivorous বা মাংসাশী তবে এদের কোনো কোনো প্রজাতি Herbivorous বা শাকাশী হয়ে থাকে, যারা সংখ্যায় খুবই কম। এরা কিন্তু উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর। এরা উদ্ভিদের পাতা এবং রস খেয়ে উদ্ভিদের ক্ষতি করে থাকে। তবে অধিকাংশ লেডি বার্ড বিটল উপকারী। কারণ তারা অন্য প্রজাতির পোকাকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। যেমন- অ্যাপিড, স্কেল ইনসেক্ট, মাইট ইত্যাদি। আর এজন্য কৃষকেরা লেডি বার্ডকে তাদের বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। নিজেদের ফসলের মাঠে এদের সাবলীল বিচরণ দেখতে পেলে কৃষক খুশি হয় এবং লেডি বার্ডকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে কল্পনা করে।

লেডি বার্ড বিটল পাতার উলটা দিকে গুচ্ছাকারে ডিম পাড়ে এবং সাধারণত অ্যাফিড পতঙ্গের নিকটে এরা ডিম দেয় যাতে করে ডিম ফুটে লার্ভা বের হলে পর্যাপ্ত খাবার পায়। লার্ভা কয়েকবার আকারে ও বর্ণে পরিবর্তিত হয়ে পিউপা গঠন করে। পিউপা ১ সপ্তাহ বা তার কিছু বেশি সময় থাকার পরে পূর্ণাঙ্গ লেডি বার্ড বিটল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরা গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে বেশি সক্রিয় থাকে, তখন এদেরকে ফসলের ক্ষেতে, তৃণভূমিতে, নদীর ধারে ইত্যাদি জায়গায় দেখা যায়। তবে শরতে যখন তাপমাত্রা কমে যায়, তখন এদের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থান। পচা গাছের গুঁড়ির নিচে, পাথরের নিচে এমনকি আবাসগৃহের মধ্যেও দেখা যায়। কখনো কখনো এরা কলোনি করে শীত নিদ্রায় থাকতেও ভালোবাসে। এরূপ একেকটি কলোনিতে প্রায় হাজার বা তারও বেশি লেডি বার্ড থাকতে পারে। এদের জীবনকাল গড়ে ১- ২ বছর।

এত চমৎকার, সুন্দর, উপকারী লেডি বার্ড বিটলের কিন্তু শত্রুর অভাব নেই। মূলত পাখিরা এদেরকে শিকার করে থাকে। পাখি ছাড়াও ব্যাঙ, বোলতা, মাকড়সা, ফড়িং ইত্যাদি এদেরকে শিকার করে থাকে। শিকারির চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করার জন্য এরা বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে থাকে। যেমন- অনেক সময় এরা মৃতের মতো ভান করে পড়ে থাকে। ফলে শিকারি প্রাণীরা এদেরকে মৃত ভেবে আর আক্রমণ করে না। এছাড়া অনেক সময় লেডি বার্ডের গায়ের উজ্জ্বল বর্ণ দেখে শিকারিরা বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং আক্রমণ হতে বিরত থাকে। আবার শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে বা বিব্রতকর কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে এরা এদের পায়ের সন্ধিস্থল থেকে এক ধরনের হলুদ বর্ণের তৈল জাতীয় পদার্থের নিঃসরণ করে থাকে। এর বাজে গন্ধের জন্য শত্রুরা আর লেডি বার্ডের ধারে কাছে ভিড়ে না।

কীটপতঙ্গ দমনের জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি আছে, যেমন- রাসায়নিক পদ্ধতি, জীব দমন পদ্ধতি (biological control), সমন্বিত দমন পদ্ধতি ইত্যাদি। তবে দমন পদ্ধতিতে লেডি বার্ড বিটল বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া লোকজ চিকিৎসা হিসেবে পেটে ব্যথা, দাঁতে ব্যথা, হাম ইত্যাদির চিকিৎসায় লেডি বার্ড বিটল ব্যবহৃত হয়। তবে এই পোকাটি অমরত্ব লাভ করেছে শিশুদের একটি ছড়ার নামকরণের জন্য। Lady bird নামের ছড়াটি শিশুদের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয় এবং পোকাটিও শিশুদের খুব প্রিয়। ছড়াটির প্রথম কয়েকটি লাইন হলো -

Ladybird, ladybird fly away home
Your house is on fire and your children all gone
All except one, and that's little Ann
And she has crept under the warming pan.

লেখক : সহকারী প্রফেসর, জীববিজ্ঞান বিভাগ, নোয়াখালি সরকারি কলেজ, নোয়াখালি।

নিবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্ব আছে মাছিরও

মো. আফতাব হোসেন

ডিপটেরা (Diptera) বর্গের অন্তর্গত পতঙ্গসমূহকে সাধারণত মাছি বলে অভিহিত করা হয়। এসব পতঙ্গের একজোড়া ঝৈল্লিক ডানা আছে। পিছনের ডানা জোড়া প্রায় অবলুপ্ত এবং পরিবর্তিত হয়ে হলটেয়ার (Haltere) গঠন করে যা দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। এদের মুখোপাঙ্গ চোষণ করার উপযোগী, তবে কিছু সংখ্যক পতঙ্গে তা একটা শুঁড়ে (Proboscis) পরিণত হয়। কীটপতঙ্গের বৃহত্তর বর্গগুলোর মধ্যে এ বর্গটি অন্যতম। এ বর্গের প্রজাতি সংখ্যা ৮৫,০০০ এর অধিক। ডিপটেরা বর্গ নেমাটোসেরা (Nematocera), ব্রাকিসেরা (Brachycera) এবং সাইক্লোর‍্যাফা (Cyclorrapha) নামক তিন উপবর্গে বিভক্ত।

উপবর্গ নেমাটোসেরা : পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় শুঙ্গ বহু খণ্ডে গঠিত। শুঙ্গ মস্তকখণ্ড এবং বক্ষদেশ হতে বড়ো। নেমাটোসেরা উপবর্গের অধীনে ২৩ টি গোত্র রয়েছে তন্মধ্যে সাইকোডিডি (Psycodidae), কুলিসিডি (Culicidae) ও সেসিডোমায়িডি (Cecidomyiidae) অর্থনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গোত্র সেসিডোমায়িডি : এ গোত্রের পতঙ্গগুলো 'গলমিজ' নামে পরিচিত। এসব মাছিগুলো আমের মুকুল, ধান, গমসহ আরো অন্যান্য ফসলে গলের সৃষ্টি করে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে।

উপবর্গ ব্রাকিসেরা : এ উপবর্গে প্রায় ১৭ টি গোত্র রয়েছে, তারমধ্যে ট্যাবানিডি (Tabanidae) গোত্রটি বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এ্যাসাইলিডি (Asilidae) গোত্রের দস্যু মাছি (Robber fly) গুবরেপোকা, জলফড়িং, মৌমাছি, ইত্যাদি খায়।

গোত্র ট্যাবানিডি : এ মাছিগুলো হরিণ বা ঘোড়ার মাছি নামে পরিচিত। এদের স্ত্রী মাছি স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্ত শোষণ করে খায় এবং পুরুষ মাছি ফুলের পরাগ ও মধু খায়। আমাদের দেশে দুই প্রজাতির ঘোড়ার মাছি গৃহপালিত পশুদের রক্ত শোষণ করে খায়।

উপবর্গ সাইক্লোর‍্যাফা : এই উপবর্গটি দুইটি বিভাগে বিভক্ত ১. এ্যাসাইজা (Aschiza) এবং ২. সাইজোফোরা (Schizophora)।

বিভাগ ১ এ্যাসাইজা : এ বিভাগের সিরফিডি (Syrphidae) গোত্রের মাছিকে সাধারণত হোভার মাছি (Hover fly) বা সিরফিড মাছি বলা হয়। এরা জাবপোকা, ছাতরা পোকা, বিভিন্ন প্রজাতির হেমিপ্টেরান পতঙ্গ খেয়ে থাকে।

বিভাগ ২ সাইজোফোরা : কালিপটারের উপর ভিত্তি করে এদের দুইটি সেকশনে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

সেকশন ১ এ্যাকালিপট্রাটি (Acalyptratae) : এদের নীচের বা ভিতরের দিকের ক্যালিপটার খুবই ছোটো। এ সেকশনে প্রায় ৪৮টি গোত্র রয়েছে তন্মধ্যে টেফ্রিটিডি (Tephritidae) এবং এগ্রোমাইজিডি (Agromygidae) গোত্র অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

গোত্রসাইকোডিডি : এ মাছিগুলো সাধারণত মথ মাছি বা বালুর মাছি (Sand fly) নামে পরিচিত। এদের পা, দেহ এবং পাখায় লম্বা ও পুরু রোম দেখা যায়। ডানায় বহু লম্বাকার শিরা আছে। বাংলাদেশে *Phlebotomus argentipes* প্রজাতির স্ত্রী বালুর মাছি কালাজ্বরের জীবাণু বহন করে এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত শোষণ করে খায়। বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও টাঙ্গাইল জেলায় বালুর মাছির উপস্থিতি দেখা যায়। ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ি উপজেলায় এ মাছির প্রাচুর্যতা সবচেয়ে বেশি, বিধায় এ এলাকায় কালাজ্বরের প্রকোপ বেশি। স্বাস্থ্য

পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী বালুর মাছি

আপদ হিসেবে দারুণ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে মানুষের চরম অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন করে। এদের স্ত্রী মাছিদের বোলতার হুলের মতো ovipositor থাকে যার সাহায্যে এরা সতেজ ফলের মধ্যে ডিম ঢুকিয়ে দেয়। ডিম থেকে ৩৬-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে লার্ভা বের হয়ে আসে এবং এই লার্ভাগুলোই ফলটিকে ভক্ষণ করে নষ্ট করে ফেলে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৮২ টি স্থানে জরিপ করে ১৫ প্রজাতির নতুন রেকর্ডসহ মোট ২১ প্রজাতির ফলের মাছি শনাক্ত করেছেন।

অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান মতে ১৯৯৪ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১,০৯,২২৫ জন কালাজ্বরের রোগী পাওয়া গেছে যার মধ্যে ৩২৯ জন মারা গেছেন।

গোত্র কুলিসিডি : এ গোত্রের পতঙ্গগুলোই প্রকৃত মশা নামে পরিচিত। এদের শুঁড় আছে যা দিয়ে ছিদ্র করতে পারে। এদের পা বড়ো। *Anopheles* প্রজাতির মশা মানুষের ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে। *Culex fatigans* মশা আমাদের দেশে গোদ রোগের জীবাণু বহন করে। বাংলাদেশের বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার উত্তরাঞ্চলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। *Aedes* মশা ঢাকা জেলায় বেশি দেখা যায় এবং এরা ডেঙ্গুজ্বর, পীতজ্বর, চিকুনগুনিয়া, জীকাজ্বর এবং এনসেফালিটিস রোগের বাহক জীবাণু বহন করে।

গোত্র টেফ্রিটিডি : এ গোত্রের মাছিগুলোকে ফলের মাছি বলা হয়। Tephritidae গোত্রের মাছিগুলোকে প্রকৃত ফলের মাছি বলা হয় কারণ এরা জীবন্ত ফলমূল ও শাকসবজি আক্রমণ করে। হর্টিকালচারাল শষ্যের প্রত্যক্ষ ক্ষতি ছাড়াও এসব মাছি শষ্যের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে কোয়ারেনটাইন

আক্রান্ত ফসলের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের ফলের মাছিগুলোকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা যায়। ১. ফল আক্রমণকারী ফলের মাছি, যেমন– ওরিয়েন্টাল ফলের মাছি (*Bactrocera dorsalis*), পীচ ফলের মাছির (*B. zonata*), ইত্যাদি ২. সবজি ফসল এবং এর ফুল আক্রমণকারী ফলের মাছি, যেমন- মেলন ফলের মাছি (*B. cucurbitae*), পাম্পকিন ফলের মাছি (*B. tau*),

পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী এডিস মশা

স্ত্রী ওরিয়েন্টাল ফলের মাছি

ইত্যাদি ৩. ননপেস্ট (অক্ষতিকর) ফলের মাছি, এসব ফলের মাছি হর্টিকালচারাল ফসলের কোনো ক্ষতি করে না । যেমন *B. nigrifacia, B. rubigina,* ইত্যাদি।

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় ফল আক্রমণকারী ওরিয়েন্টাল ফলের মাছি ও পিচ ফলের মাছির উপস্থিতি দেখা যায় এবং এরা আম, পেয়ারা, সফেদা, কলার মারাত্মক ক্ষতি করে। এ দুই প্রজাতির ফলের মাছির পপুলেশন জুন-জুলাই মাসে সবচেয়ে বেশি থাকে এবং জানুয়ারি মাসে সবচেয়ে কম থাকে।

মেলন ফলের মাছি ও পাম্পকিন ফলের মাছি বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় দেখা যায় এবং এরা কুমড়া জাতীয় সবজি যেমন- লাউ, মিষ্টিকুমড়া, শশা, চালকুমড়া, স্কোয়াশ, করলা ইত্যাদির মারাত্মক ক্ষতি করে। মার্চ মাসে এ দুই প্রজাতির ফলের মাছির পপুলেশন সবচেয়ে বেশি থাকে এবং আগস্ট মাসে সবচেয়ে কম থাকে।

গোত্র এগ্রোমাইজিডি : এ গোত্রের পতঙ্গগুলোকে সাধারণত পাতাসুড়ঙ্গকারী মাছি বলা হয়। এ মাছিগুলো ছোলা, বরবটি, শীম, ক্যাপসিকাম ইত্যাদি উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ডের ভিতর সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফলে গাছটি নিস্তেজ হয়ে মারা যায়।

সেকশন কালিপট্রাটি : এদের নিচের বা ভিতরের দিকের ক্যালিপটার বিরাট। এ সেকশনে প্রায় ১১টি গোত্র রয়েছে তন্মধ্যে গোত্র মাসসিডি (Muscidae), ক্যালিফোরিডি (Calliphoridae), ট্যাচিনিডি (Tachinidae) এবং সারকোফ্যাজিডি (Sarcophagidae) উল্লেখযোগ্য।

গোত্র মাসসিডি : আমাদের অতি পরিচিত ঘরের মাছি, *Musca domestica* এ গোত্রের অর্ন্তগত। আমাদের দেশে বাসা বাড়ি এবং হাট বাজারে তিন প্রজাতির ঘরের মাছি দেখা যায়। এসব মাছি কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, অ্যানথ্রাক্স এবং চোখের প্রদাহ সৃষ্টিকারী রোগের জীবাণু বহন করে। সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলায় গবাদিপশুর অ্যানথ্রাক্স রোগ বেশি দেখা যায়। স্টেবল মাছি, *Stomoxys* sp. মানুষ ও গবাদি পশুকে কামড়াতে পারে এবং রোগের জীবাণু বহন করতে পারে।

গোত্র ক্যালিফোরিডি : এ গোত্রের মাছিগুলো ব্লো মাছি বা বোতলে সবুজ মাছি নামে পরিচিত। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকা থেকে ৩ প্রজাতির ব্লো মাছি যেমন *Lucilia cuprina, L. sericata, Chrysomia megacephala* রিপোর্ট করা হয়। যারা মাচায় শুকাতে দেওয়া সামুদ্রিক মাছে ডিম পেড়ে দেয় ফলে শুটকি মাছগুলো নষ্ট হয়ে যায়। কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও নাজিরেরটেক এলাকায় এসব ব্লো মাছিগুলো প্রায় ৩০% এর অধিক শুটকি মাছ নষ্ট করে। ভেড়ার ব্লো মাছি নিয়ন্ত্রণের জন্য কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানীগণ পোকা বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি (Sterile Insect Technique) উদ্ভাবন করেছেন, যা মাঠপর্যায়ে সফলভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

গোত্র ট্যাচিনিডি : ডিপটেরা বর্গের সবচেয়ে উপকারী গোত্র এটি। এ গোত্রের মাছিগুলো প্রায় সকলেই অন্য পতঙ্গের পরজীবী এবং এরা মথ জাতীয় পতঙ্গ, ঘাসফড়িং, হেমিপটেরান পতঙ্গ, বিটল পতঙ্গের জৈবিক দমনে ভূমিকা রাখে। শুধুমাত্র উজি মাছি, *Exorista sorbillans* রেশমপোকার লার্ভার উপর ডিম পেড়ে দেয় ফলে রেশম পোকাটি মারা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ

জেলার ভোলাহাট অঞ্চলে বর্ষার শেষে অনেক কৃষকের বাড়িতে শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ রেশম পোকা শুধু এই মাছির আক্রমণে মারা পড়ে।

গোত্র সারকোফ্যাজিডি : এ গোত্রের মাছিদের মাংশের মাছি (Flesh fly) নামে অভিহিত করা হয়। কক্সবাজার এলাকায় *Sarcophaga* sp. মাচায় শুকাতে দেওয়া সামুদ্রিক মাছে ডিম পেড়ে দেয় ফলে শুটকি মাছ নষ্ট হয়ে যায়।

কীটপতঙ্গের অধিক গুরুত্বপূর্ণ বর্গগুলোর মধ্যে এ বর্গটি অন্যতম। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক প্রজাতি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত শোষণ করে খায়। শুধু মাছ বাদে আর এমন কোনো মেরুদণ্ডী প্রাণী নাই যারা এদের কবল থেকে রক্ষা পায়। কিছু কিছু পতঙ্গ ম্যালেরিয়া, নিদ্রারোগ, পীতজ্বর, টাইফয়েড জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, চিকুনগুনিয়া, গোদ, আমাশয় প্রভৃতি রোগের জীবাণু বহন করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ বাহক মাছিগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কিছু কিছু মাছি হর্টিকালচারাল শষ্যের ক্ষতি করে। অনেক মাছি ফুলের পরাগায়ণে সাহায্য করে। বর্গটিতে উপকারী পরজীবী পতঙ্গও আছে। কীটতত্ত্ববিদগণ অপকারী বাহক ও আপদ মাছিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ এবং উপকারী পরজীবী মাছিগুলোর উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ মাছিগুলোর ভূমিকা আরো অনেক বাড়বে।

লেখক : প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, খাদ্য এবং বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পারমানবিক শক্তি কমিশন

কাজ নিয়েছি

খুরশীদ আলম বাবু

এসব আমার প্রিয় দৃশ্য
হোক না যতই ছড়ানো,
দূরে নদী-যাচ্ছে নৌকা
যায় না দৃষ্টি নড়ানো।
ঘরে আছি জানালা খুলে
দিচ্ছে দোলা আওলা চুলে
বাতাস মৃদু মন্দ
ঘরের পাশে সজনে গাছে
দুপুর যেন ঘুমিয়ে আছে
তবুও দেখি ছন্দ,
লুকিয়ে আছে সবুজ পাতায়
এবং আমার লেখায় খাতায়
আসছে ওরা ছুটে
আমিই কেবল লেখার ঘরে
খুঁজছি ওদের চরাচরে
লেখার বিষয় খুঁটে
এসব আমার প্রিয় দৃশ্য
যায় না তো আর সরানো
কাজ নিয়েছি ছড়া লিখে
একে ওকে পড়ানো।

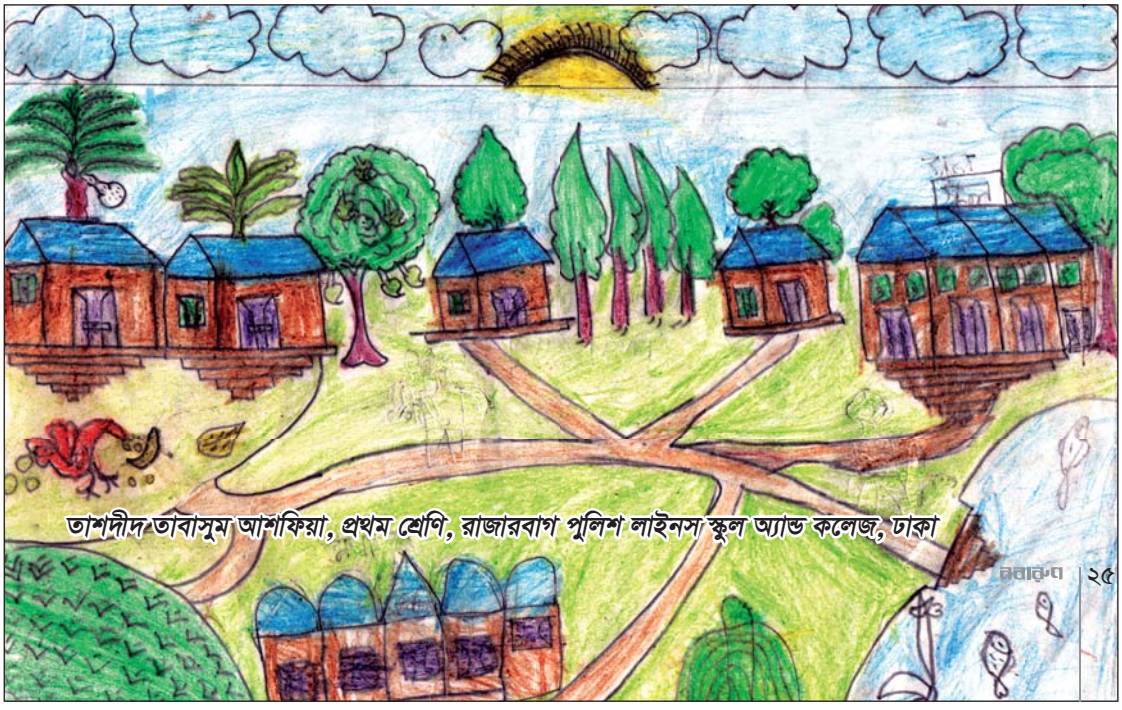

তাশদীদ তাবাসুম আশফিয়া, প্রথম শ্রেণি, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

গল্প

হুক্কা হুয়া ॥ হাসান ইকবাল

বানরের খুব মন খারাপ। পথে দেখা শেয়ালের সাথে। শেয়াল বলল- 'মন খারাপ কেন?'

বানর বলল, 'মন খারাপ হবে না! দেখ তো দেখি কী বিপদ!'

বানর উপরের দিকে তাকিয়ে তার ফুলা লম্বা লেজটা টেনে ধরে। মন খারাপ করে বলল- 'আমার লেজটা না ফুলে গেছে।'

কীভাবে?

বানর বলতে শুরু করল- 'ঐ যে দেখছ না সবুজ পাহাড়ের সুন্দর গাছ। ওখানে রাত পোহালে সুন্দর ফুল ফোটে। রাতে জ্বলে ওঠে হাজারো জোনাকির আলো।'

শেয়াল মাথা নাড়ালো- 'হুম'।

'সন্ধ্যে হলে শুকতারারাও মিটিমিটি হাসে তাদের আলো দেখে।' - বানর বলল।

শেয়াল বলল- 'আচ্ছা, তুমি তো বলছই না তোমার মন খারাপ কেন হলো?'

বানর বলল - 'সকালবেলা যখন রোদ উঠল ঐ পাহাড় জুড়ে। আমি গিয়েছিলাম হাজার রঙের প্রজাপতি দেখতে। প্রজাপতিরা আমার সাথে নাচলো। গান গাইলো। মজা হলো!'

শেয়াল - 'তারপর...।'

বানর বলল - 'তারপর প্রজাপতিরা বলল, অনেক মজা হলো, এখন খিদে পেয়েছে। চলো মধু খেয়ে আসি।'

শেয়াল - 'হ্যাঁ, মধু খেতে তো দারুণ মিষ্টি।'

বানর বলল - 'যেই না আমি মধু খেতে গেছি মৌমাছির চাকে, আমার লেজ কামড়িয়ে ফুলিয়ে দিল।'

শেয়াল - 'তুমি মৌমাছিদের খাবার খেতে গেছ, তারা তো কামড়াবেই।'

বানর বলল - 'প্রজাপতিরা ফুল থেকে মধু খেল, আমিতো ফুল থেকে মধু বের করতে পারি না।'

শেয়াল - 'মধুতো তোমার আসল খাবার নয়। তুমি ফল খাবে, অন্যকিছু খাবে।'

বানর বলল - 'উহ...আমার লেজ ফুলে গেছে। হুলের ব্যথা লেগে আছে লেজে। কী করব আমি?'

শেয়াল - 'তুমি আমার বাড়ি চলো, আমার কাছে দুটো কাঠবাদাম আর কলা আছে। কাঠবাদাম কলা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।'

বানর বলল- 'চলো যাই'

শেয়াল আর বানর দুজনে মিলে চলে এল পাহাড়ের নিচে গুহা বাড়িতে । সে এক নির্জন বাড়ি। আলো নেই পাহাড়ের মতো।

কলা আর কাঠবাদাম খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল বানর। যখন ঘুম ভাঙলো তখন তার আর মন খারাপ নেই।

সন্ধ্যে হয়ে এল। বাইরে ঝিঁঝি পোকারা ডাকছে।

শেয়ালের বাবুগুলো একসাথে জটলা বেঁধেছে। চার চারটা শেয়াল, ছোটো-বড়ো-মাঝারি শেয়াল। সবাই একসাথে গেয়ে উঠল- হুক্কা, হুয়া।

বানরের মন ভালো। কী অদ্ভুত সুন্দর শেয়ালের ভাষা। সেও গেয়ে উঠল - হুক্কা হুয়া। আওয়াজ হলো কি? কিঁচ কিঁচ! কিঁচ কিঁচ!!

ডেঙ্গু ভাইরাস ও বাহক মশা এডিস

প্রফেসর ড. মোস্তফা দুলাল

ভাইরাস নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিনের (নিউক্লিও প্রোটিন) সমন্বয়ে গঠিত এক প্রকার অতি আনুবীক্ষণিক অকোষীয় পরজীবী যা উপযুক্ত জীব কোষের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তবে জীব কোষের বাইরে জড়বস্তুর মতো অবস্থান করে। এরা অতি ক্ষুদ্র প্রায় ২০০ মিলি মাইক্রোমিটার এর কম আয়তন বিশিষ্ট এবং মিউটেশনের মাধ্যমে নতুন স্ট্রেইন (strain) বা সেরোটাইপ সৃষ্টি করতে পারে। ডেঙ্গু জ্বর এক ধরনের ভাইরাস সংক্রমিত রোগ যা *Aedes* গণভুক্ত কতিপয় প্রজাতির মশা দ্বারা মানব দেহে সংক্রমিত হয়। ১৯৬৪ সালে ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম ডেঙ্গু জ্বর দেখা দেয়। তখন এ রোগ ঢাকাইয়া জ্বর নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞগণ রোগীর দেহ থেকে ডেঙ্গু ভাইরাস শনাক্ত করেন। তবে নব্বই দশকের শেষের দিকে এ দেশে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির নামে চিকিৎসা কীটতত্ত্ববিদদের একটি দল বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সচেতন করার প্রয়াস চালিয়ে আসছেন। ২০০১ সালে এ দেশে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ে ও ৯৩ জন মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর ২০০২ সালে প্রায় দশ হাজার লোক এ রোগে আক্রান্ত হয় ও অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এদেশে ডেঙ্গু জ্বরের সংক্রমণ কমবেশি অব্যাহত রয়েছে। চলতি বছরে বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চার হাজার ডেঙ্গু রোগী এ যাবৎ চিকিৎসা নিয়েছে।

ডেঙ্গু ভাইরাস স্বভাবগত দিক থেকে মানব দেহে মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবী ডেঙ্গু ভাইরাস মানব দেহসহ কতিপয় প্রাইমেট প্রাণীতে এবং এডিস গণভুক্ত কতিপয় প্রজাতির মশার দেহে অবস্থান করে।

ডেঙ্গু ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য

১. ডেঙ্গু ভাইরাস গোলাকার ও ৫০ মাইক্রোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট্য

২. প্রোটিন ও লিপিডের সমন্বয়ে গঠিত মোড়কের (envelop) ভেতরে এক সূত্র RNA বিদ্যমান

৩. ডেঙ্গু ভাইরাসের চার ধরনের সেরোটাইপ যথা- DEN ১,২,৩,৪ বিদ্যমান।

পোষক ও বাহক

মানুষ ডেঙ্গু ভাইরাসের জৈব সঞ্চয়ী পোষক (biological reservoir) হিসেবে কাজ করে। মানব দেহে এ ভাইরাস সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এছাড়া কতিপয় প্রাইমেট প্রাণীতে ডেঙ্গু ভাইরাস পরিলক্ষিত হয়। *Aedes* গণভুক্ত কয়েক প্রজাতির মশা ডেঙ্গু ভাইরাস নিজ দেহে বহন করে ও বিস্তার ঘটায়।

এডিস মশার স্বভাব, বাসস্থান ও খাদ্যাভ্যাস

স্বভাবগত দিক থেকে বলা যায়, এডিস মশা দিবাচর ও সাধারণত সকাল ও সন্ধ্যার পূর্বে বেশি কামড়ায়। এ মশা মানুষের বসতবাড়িতে বাস করে। তাই এদেরকে ঘরের মশা বলা হয়। এরা ঘরের বিভিন্ন স্থানে রাখা কাপড়চোপড়, আসবাবপত্রের নিচে, দেয়ালে টাঙানো ছবির পেছনে, কোনো ঝুলন্ত জিনিসের উপর বিশ্রাম নেয়। ঘরের বাইরে ঝোপঝাড়ে এদের কম দেখা যায়। সকালবেলা অপেক্ষা সন্ধ্যার আগে এদের বেশি সক্রিয় দেখা যায়। *Aedes* মশা মানুষসহ অন্যান্য মেরুদণ্ডীদের রক্ত পান করে।

এডিস মশার শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. এরা মাঝারি আকৃতির ২. এদের গায়ের বর্ণ কালো তবে সমস্ত দেহের বিভিন্ন অংশে সাদা আঁইশ ও হালকা হলুদ বর্ণের ডোরাকাটা দাগ আছে ৩. এদের বক্ষের পৃষ্ঠীয় দিকে অনুদৈর্ঘভাবে দুটি বাঁকা সাদা রেখা এবং মাঝ বরাবর দুটি সমান্তরাল সাদা রেখা বিদ্যমান ৪. এদের মস্তক চওড়া, চ্যাপটা ও আঁইশে আবৃত থাকে ৫. এদের ১ম জোড়া ডানা সক্রিয় ও ২য় জোড়া হলটেয়ারে পরিণত হয় ৬. এদের মাথায় এক সারি আঁইশ খাড়াভাবে সাজানো থাকে ৭. এদের তিন জোড়া শুঁড় ও লম্বা থাকে।

এডিস মশার প্রজনন স্থান

যেখানে সেখানে, বাড়ির ছাদে, ঘরের বারান্দায় থাকা মাটির ভাঙা ও ভালো পাত্র, বিভিন্ন ধরনের বোতল, প্লাস্টিক ও টিনের কৌটা, ডাবের খোসা, ফেলে রাখা মটরের টায়ার, চৌবাচ্চা, মটকা, কলসি, পানির ড্রাম, ফুলদানি, ফুলের টব, গরু-ছাগলের পানি পান করার পাত্র (trough), জলকান্দা (antgurd), গাছের ফোকর, ফাটা বাঁশ প্রভৃতি স্থানে জমে থাকা পরিষ্কার পানি এডিস মশার অন্যতম প্রজনন স্থান।

এডিস মশার জীবনচক্র

ডিম (Egg): পরিষ্কার পানিযুক্ত আবদ্ধ স্থানে বা পাত্রের গায়ে এডিস মশা ডিম পাড়ে। এ মশা একটি একটি করে ৪-৫ দিন পর পর প্রতিবার ১০-১০০টি করে ৩০০-৭৫০টি ডিম পাড়ে। পাত্রের গায়ে লেগে থাকা ডিম পানির সংস্পর্শে এলেই ডিম থেকে লার্ভা বের হয়। পানির তাপমাত্রা ২৫-৩০ ডিগ্রি হলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ডিম থেকে লার্ভা বের হয়। তবে ডিম পানির সংস্পর্শে না এলে চার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

লার্ভা (Larva): এডিস মশার লার্ভার শ্বসন নল পুরু এবং ছোটো। এদের মস্তক পানির উপরিতল থেকে অক্ষীয় দিকে মুখ করে থাকে। এরা বটম ফিডার।

পিউপা (Pupa): এডিস মশার লার্ভা দশা ২৫- ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৫-৭ দিনের মধ্যে পিউপায় পরিণত হয়। পিউপার বক্ষে শ্বসন নল বিদ্যমান ।

পূর্ণাঙ্গ মশা (Adult): এডিস মশা পিউপা থেকে ১-৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয়। পূর্ণাঙ্গ এডিস মশার জীবনকাল তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, খাদ্য ও প্রজনন কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করে। যে স্ত্রী এডিস মশা রক্ত পান করে তারা গড়ে ৬২ দিন ও যারা রক্ত পান করে না তারা গড়ে ৮২ দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে। রক্ত পান করে এরকম গড়ে কম দিন বাঁচার কারণ তারা ডিম পাড়ার সময় অনেকে মারা যায়। গরমকালে আর্দ্রতা কম থাকায় মশার আয়ুহ্রাস পায়।

ঋতুকালীন প্রাদুর্ভাব

সারা বছর এডিস মশা দেখা গেলেও বর্ষার আগে ও পরে বেশি দেখা যায়। ঋতুকালীন প্রভাব নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের পৌনঃপুনিকতা, শীতকালের সময়সীমা ও ডিম পাড়া পাত্রের সংখ্যার ওপর। ভরা বর্ষায় বৃষ্টিপাত বেশি থাকায় এডিস মশার ডিম পাড়া পাত্রের পানি উপচে পড়ে ডিম, লার্ভা ও পিউপা নষ্ট হয়ে যায়। বাড়ির ভেতরে ও ছাদে পাত্রের সহজলভ্যতার কারণে সারা বছর কিছু কিছু এডিস মশা দেখা যায়।

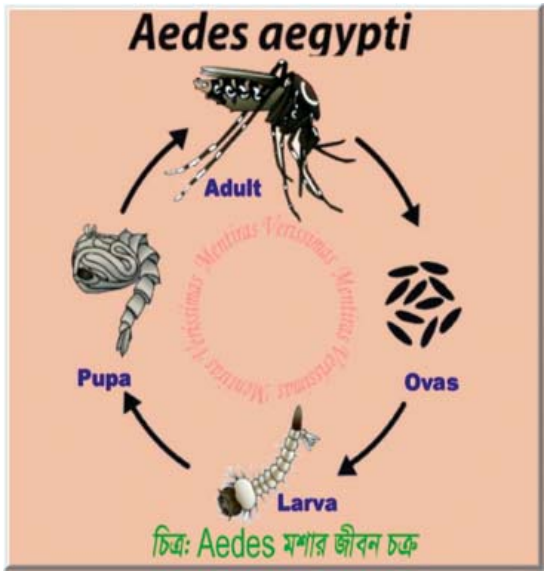

চিত্র: Aedes মশার জীবন চক্র

এডিস মশার সাথে রোগের সম্পর্ক

Aedes মশার দুটি প্রজাতি যথা *A. aegypti* ও *A. albopictus* বাংলাদেশে সচরাচর দেখা যায়। এ মশা ডেঙ্গু জ্বর, রক্তক্ষরণ জ্বর, চিকুনগুনিয়া, পীত জ্বরসহ কয়েক প্রকার ভাইরাসজনিত মস্তিষ্ক প্রদাহ (viral encephalitis) রোগ ছড়ায়। মশার মাঝে এ সব ভাইরাসের সুপ্তকাল (incubation period) ৯-১২ দিন। এ মশার মধ্যে একবার ভাইরাস প্রবেশ করলে এ মশা যত দিন বেঁচে থাকে ততদিন রোগ সংক্রমণে সক্ষম থাকে, এমনকি ডিমের মাধ্যমে ভাইরাস এদের পরবর্তী বংশধরের মধ্যে সঞ্চারিত হয় ও মানব দেহে সংক্রমণ চালু রাখতে পারে।

ডেঙ্গু ভাইরাসের বিস্তার ও সংক্রমণ কৌশল

ডেঙ্গু জ্বর মূলত একটি আরবো ভাইরাস সংক্রমিত জুনোটিক রোগ। যা প্রাণী থেকে *Aedes* গণভুক্ত মশা বিশেষ করে *A. agypti* ও *A. albopictus* স্ত্রী মশা দ্বারা দংশনের মাধ্যমে মানব দেহ ও অন্যান্য প্রাইমেট সদস্যদের দেহে সংক্রমিত হয়। ডেঙ্গু ভাইরাস যুক্ত সংক্রমণ ক্ষমতা সম্পন্ন স্ত্রী মশা সুস্থ মানুষকে দংশন করলে সুস্থ ব্যক্তি ৪-৭ দিনের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ৬ দিনের মধ্যে *Aedes* মশা কামড় দিলে কেবল সেই মশা ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী হয়। মানব দেহের রক্ত কোষের বিশেষ করে মনোসাইটের পৃষ্ঠের সুনির্দিষ্ট রিসেপ্টরে ডেঙ্গু ভাইরাস যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক ক্রিয়ায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রাথমিক সূচনা হয়। এ ভাইরাস এন্ডোসাইটোসিস পদ্ধতিতে এন্ডোসোমকে এসিডিফিকেশন করে তার দেহের মোড়ক (envleop) বিগলিত করে। অতঃপর পোষকের রাইবোসোমে সিঙ্গেল পলিপেপটাইড এবং সাইটোপ্লজমে ক্যাপসিড তৈরি করে। অতঃপর পোষক কোষের এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে বাড (bud) হিসেবে প্রকাশ পায়। তাছাড়া বিভিন্ন জাতের বা সেরোটাইপের (serotype) ভাইরাসের পারস্পারিক ক্রিয়ায় হিমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বরের প্রকাশ পায়।

(ক) ডেঙ্গু জ্বরের প্রকারভেদ ও লক্ষণ

ক্লাসিক্যাল বা সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর

১. সাধারণ ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর (১০৪-১০৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট) শুরু হয়ে ৩-৭ দিন পর্যন্ত থাকে

২. প্রচণ্ড মাথা ব্যথা থাকে বিশেষ করে চোখের পেছনে প্রচণ্ড ব্যথা থাকে

৩. হাঁটু, কনুই ও পায়ের গোড়ালিতে এবং অস্থিসন্ধিতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়

৪. মুখে খাবারের স্বাদ পায় না ও খাবার গ্রহণে অনীহা দেখা দেয়

৫. উদরে ব্যথা, বমি ভাব ও ডায়রিয়া হয়

৬. রোগীর গায়ে গোলাকৃতি লাল রঙের বিন্দু বিন্দু রেস বা ফোসকা দেখা যায়

৭. রোগী ক্লান্ত বোধ করে ও শরীর চুলকায়।

(খ) ডেঙ্গু হিমোরেজিক জ্বর

ডেঙ্গু হিমোরেজিক জ্বর রোগ অত্যন্ত জটিল ও প্রাণঘাতী (fatal) হয়। একাধিকবার ডেঙ্গু ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে ডেঙ্গু হিমোরেজিক জ্বর হয়। ডেঙ্গু হিমোরেজিক

জ্বরের লক্ষণগুলো হলো:

১. মাথা ব্যথা, পেটে ব্যথাসহ জ্বর থাকে।

২. চামড়ায় রক্তের লাল ছোপ বা লাল বিন্দু দেখা যায়।

৩. নাক, মুখ, দাঁতের মাড়ি ও চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ হয়

৪. চোখে রক্ত জমাট বাঁধে

৫. রক্তে প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে অণুচক্রিকা বা প্লেইটলেট হ্রাস পেয়ে এক লাখের নিচে নেমে যায়

৬. রোগীর দেহে অ্যান্টিবডি ও হিমোগ্লোবিন বাড়ে তবে শ্বেত কণিকা এবং ইএসআর (erythrocyte sedimentation rate) হ্রাস পায়

৭. কতিপয় রোগীর রক্তচাপ হ্রাস পেয়ে ১২-২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা যেতে পারে।

(গ) ডেঙ্গু শক সিনড্রোম

ডেঙ্গু হিমোরেজিক জ্বরের উপসর্গগুলোর পাশাপাশি রোগীর নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়:

১. রোগীর রক্তচাপ হঠাৎ কমে যায়

২. হাত-পা শীতল হয়ে আসে

৩. রোগীর নাড়ির গতি বৃদ্ধি পায়

৪. রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে ও রোগী অজ্ঞান হতে পারে।

৫. পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়

৬. দেহের তাপমাত্রা ওঠানামা করে

৭. রোগীর প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে অনুচক্রিকা (স্বাভাবিক ১৫০০০০- ৩০০০০০) পঞ্চাশ হাজারে নেমে আসে

৮. এক্ষেত্রে প্যাকড সেল ভলিউম (পিভিসি) অনেক বেশি বেড়ে যায়

৯. রোগী অচেতন হয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা যেতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বর নিরূপণ

১. রোগীর রোগের ইতিহাস জানতে হবে

২. রোগ নিরূপণে উপরে উল্লিখিত লক্ষণগুলো বিবেচনায় নিতে হবে

৩. শারীরবৃত্তীয় পরীক্ষায় রক্তের প্লেইটলেটের সংখ্যা গণনা করে রোগ নিরুপণ করা যায়

৪. রোগীর সিরাম, প্লাজমা, রক্ত, কোষ ও কলার নমুনা পরীক্ষা করে ডেঙ্গু ভাইরাস, ভাইরাসের নিউক্লিক এসিড ও এন্টিজেন শনাক্ত করে রোগ নিরূপণ করা যায়

৫. রক্তের নমুনায় অ্যান্টিবডির পরিমাণ ও হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ণয় করে ডেঙ্গু রোগ নিরূপণ করা যায়।

সুপ্তকাল

মশার কামড়ের মাধ্যমে সুস্থ দেহে ডেঙ্গু ভাইরাস প্রবেশের পর ৩-৭ দিনের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বর প্রকাশ পায়।

ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

১. ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক এডিস মশার আবাসস্থল ধ্বংস করা

২. খোলা চৌবাচ্চা, পরিত্যক্ত টায়ার, ভাঙা ড্রাম, ফুলের টব, পলিথিন ব্যাগ , ডিমের খোসা, ডাবের খোসা, ভাঙা টিনের কৌটা, প্লাস্টিক সামগ্রী, এয়ার কন্ডিশন, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদিতে পানি জমতে না দেওয়া

৩. ড্রাম, পানির ট্যাংকি , বাথরুমের বালতি ইত্যাদি পানি রাখার পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা

৪. প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে নিশ্চিত হওয়া রান্নাঘর, বাথরুমের বালতি, টয়েলেট পরিষ্কারের ব্রাশ স্টেন্ড, গোসলখানা প্রভৃতিতে পানি জমা নেই

৫. ঘরে বা আশপাশের যে-কোনো স্থানে জমে থাকা পানি, জলকান্দা, ফুলদানিতে দেওয়া পানি তিনদিন পর পর ফেলে দিয়ে নতুন করে ভরা

৬. ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ঘষেমেজে পরিষ্কার করা

৭. কয়েল, ম্যাট, লিকুইড প্রভৃতি মশক বিতাড়ক ব্যবহার করা

৮. প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আসবাবপত্র, পর্দার পেছনে, খাটের নিচে, দেয়ালে টাঙানো ছবির পেছনে ও অন্যান্য অন্ধকার স্থানে মশা মারার কীটনাশক স্প্রে করা

৯. অব্যবহৃত যে-কোনো ধরনের পাত্র বিনষ্ট করা বা উলটে রাখা যাতে পানি জমতে না পারে

১০. দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করা

১১. জানালা, দরজা ও ভেন্টিলেটরে মশা প্রতিরোধক নেট লাগানো যাতে ঘরে মশা প্রবেশে বাধা সৃষ্টি হয়

১২. সকলের সকাল-সন্ধ্যায় ফুল হাতা জামা ও ফুল প্যান্ট পড়া এবং শরীরের অনাবৃত অংশে মশা নিবারক ক্রিম, লোশন ইত্যাদি ব্যবহার করা

১৩. বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর বিশেষ করে ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি সরানোর ব্যবস্থা করা

১৪. ঘরের আঙিনায় নিমগাছ রোপণ করা

১৫. এলাকায় জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে সপ্তাহে অন্তত একদিন কেরোসিন তেল ঢেলে দেওয়া

১৬. পানির পাত্র বা চৌবাচ্চা বড়ো হলে মশা ডিম, লার্ভা, পিউপা ভক্ষণকারী মাছ যেমন- Guppy, Gambusia ছেড়ে রাখা

১৭. বড়ো চৌবাচ্চা বা ট্যাংক যেগুলো পানি শূন্য করা অসুবিধা সেগুলোতে নিরাপদ ও কার্যক্ষম কীটনাশক (যেমন abate S G 1%) ব্যবহার করে মশার লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা

১৮. পূর্ণ বয়স্ক *Aedes* মশা মারার জন্য ফগিং বা ইউ এল ভি স্প্রে মেশিন ব্যবহার করে ১০ দিন অন্তর অন্তর bendiocrab, pirimiphos, malathion ইত্যাদি কীটনাশক ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যায়

১৯. জনসাধারণকে এডিস মশার বংশ বিস্তার সম্পর্কে জ্ঞান দান করা ও মশা নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনে মশার ডিম পাড়ার পাত্র বাধ্যতামূলক বিনষ্ট করার নির্দেশনা প্রদান করা

২০. পাঠ্যপুস্তক, প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ডেঙ্গু ভাইরাস ও এডিস মশা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা

২১. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, এন.জি.ও, সরকারি, বেসরকারি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়ে ডেঙ্গু ভাইরাস ও এডিস মশার বিরূদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা

২২. মসজিদের ইমামগণ শুক্রবার জু'মার খুতবায় জনগণকে এডিস মশার ভয়াবহতা নিরসনের উপায় সম্পর্কে বলতে পারেন। অনুরূপভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে ডেঙ্গু ভাইরাস ও বাহক এডিস মশা সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন।

ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা

১. ডেঙ্গু জ্বর ভাইরাসজনিত হওয়ায় এর সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করা যায়

২. সাধারণ বা ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর এমনিতে ভালো হয়ে যায়। তবে ডেঙ্গু হিমোরেজিক জ্বর ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোমের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়

৩. জ্বর ও ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ ৯০ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য প্রতিদিন প্রয়োগ করা যায়

৪. দ্রুত জ্বর কমানোর জন্য রোগীর মাথায় পানি ঢালা ও বার বার ভিজা কাপড় দিয়ে গা মুছে দেওয়া যায়

৫. প্রস্রাব হ্রাস, ঠোঁট, মুখ শুকিয়ে গেলে ও অবসন্নতা দেখা দিলে রোগীকে খাবার স্যালাইন, ফলের রস পানি ও প্রচুর পরিমাণ তরল খাবার দেওয়া যায়

৬. হঠাৎ রক্তচাপ (blood pressure) কমে গেলে, প্যাকড সেল ভলিউম ২০ এর বেশি বেড়ে গেলে এবং রোগী মুখে খেতে না পারলে রোগীকে শিরা পথে ফ্লুইড দিতে হবে

৭. প্লেইটলেটের সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিলিটার রক্তে দশ হাজারের নিচে নেমে এলে প্লেইটলেট কনসেনট্রেট দিতে হবে

৮. জ্বর ও ব্যথা কমানোর জন্য Acetaminophen ও codeine দেওয়া যায় তবে ব্যথা নাশক ঔষধ অ্যাসপিরিন, ডাইক্লোফেনাক দেওয়া যাবে না

৯. রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

১০. বার বার রক্তচাপ পরীক্ষা করতে হবে ও রক্ত কমে গেলে রোগীর দেহে বাইরে থেকে রক্ত দিতে হবে

১১. পেঁপে পাতার (*Carica papaya*) রস (extract) দিনে তিনবার সেবনে ডেঙ্গু জ্বর উপশমে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ভেকসিনেশন (Veccination)

গত ২০১৬ সালে এপ্রিল মাসে ডেঙ্গু অধ্যুষিত এলাকায় ব্যবহারের জন্য ডেঙ্গু ভাইরাস প্রতিরোধক ভেকসিন Dengvaxia বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) অনুমোদন করে। এ ভেকসিনের পর্যায়ক্রমে ৩টি ডোজ প্রয়োগ করে ডেঙ্গু ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়া ডেঙ্গু প্রতিরোধে আরো কতকগুলো vaccine পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে। হয়ত এগুলো অচিরে WHO কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

গল্প

একটা ছিল ফড়িংবিবি

আহমাদ স্বাধীন

একটা ছিল ফড়িংবিবি। হলদি রঙের ফড়িং, থাকতো একটা হেলেঞ্চা বনে।

হেলেঞ্চা বন চেনো না! ওই যে মাঠের পাশে সবুজ সবুজ কচি পাতা থাকে। পাতাগুলো ঘাসেদের সাথে মিশে থাকে। হেলেঞ্চা হলো এক ধরনের শাক। যে শাকে অনেক ভিটামিন থাকে।

আর একটা কাঁচপোকা, সেও ছিল হেলেঞ্চা বনে। কাঁচপোকার গায়ের রং সবুজ। গাঢ় সবুজ। সে সবুজে আবার কালো কালো দাগ আছে। যেমন দাগ থাকে চিতাবাঘের গায়। তেমন দাগ থাকে কাঁচপোকাদের গায়, সব কাঁচপোকাদের গায়ে যে দাগ থাকে তা নয়, কিছু কিছু পোকার। আমি যে কাঁচপোকার কথা বলছি, সেই পোকার গায়ে এমন দাগ। এই পোকাটা ছিল বর্ণচোরা।

বর্ণচোরা কী জানো না! বলছি শোনো।

বর্ণচোরা হলো যারা গায়ের রং পরিবেশের সাথে মিলিয়ে নেয়। আর শিকারিদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়েও নেয়।

কাঁচপোকাটার গায়ের রংটাও এমন ছিল। কাঁচপোকা হেলেঞ্চা বনে এমনভাবে থাকত যে কেউ বুঝতেই পারত না। বুঝতে পারলে তো পাখি এসে তাকে খেয়ে ফেলতে পারতো। তাই কাঁচপোকাটা ছিল খুবই নিরাপদ।

পোকাটা হেলেঞ্চা বনে পাতা খেয়ে বাঁচতো। তাই তার কোথাও যেতেও হতো না।

একদিন হলো কী- হলদি রঙের ফড়িংবিবি উড়তে উড়তে ঘুরতে ঘুরতে বসল কাঁচপোকাটার গায়ে।

'এমা, এ কী কাণ্ড, তুমি আমার গায়ের উপর বসলে কেন গো?' বলল কাঁচপোকা।

ফড়িংবিবি তো অবাক, ভাবল হেলেঞ্চা পাতা কী কথা বলে! সে তার চারপাশে খুঁজতে থাকল, কোথা থেকে কোন পাতাটা কথা বলছে। কাঁচপোকাটা আবার বলল ' কী গো ফড়িংবিবি, তুমি সরছো না যে, এত জায়গা থাকতে আমার গায়ে কেন বসতে হবে?'

এবার ফড়িংবিবি বুঝতে পারল। সরে বসল একটা হেলেঞ্চা পাতায়। বলল ' তুমি কে গো ! এমন পাতার মতো রং আর পাতার সাথেই মিশে আছো, আমি তো বুঝতেই পারিনি'

'কী করে বুঝবে বলো, আমি তো লুকিয়ে থাকার জন্যই পাতার সাথে মিশে থাকি। যেন আমাকে পাখিরা দেখতে না পায়। দেখলেই যে টুপ করে খেয়ে ফেলবে।'

'তাই বলো, আমিও তো পাখিদের ভয়ে থাকি, জানো আমার একটা ভাই ছিল, লাল রঙের ছিল সে দেখতে। তাকে টুপ করে খেয়ে ফেলল একটা পাখি। আমার

গায়ের রংটা কেমন হলদি, যে-কেউ দেখতে পায়, কখন যেন আমাকেও খেয়ে ফেলে পাখিরা।'

কাঁচপোকাটা বলল, 'একটু সাবধানে থাকবে, তাহলে আর পাখি তোমায় ধরতেই পারবে না। আর ভাইয়ের জন্য যখন মন খারাপ হবে তখন আমার সাথে গল্প করতে চলে আসবে।'

'ঠিক চলে আসবো, তুমি আমার ভাইটির মতোই কথা বলো, তুমি দেখতেও অনেক সুন্দর। সবুজের সাথে কালো কালো ছোপগুলো বেশ মজার। এরকম দাগ তো বাঘেদের গায়ে থাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ, থাকে তো। আমিও তো বাগ। আচ্ছা ফড়িংবিবি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, বাগ আর টাইগার এর মধ্যে পার্থক্য কী সেটা বলো।'

'ও আচ্ছা, তাই বলো, এটাতো অনেক সহজ প্রশ্ন। বাঘ আর টাইগার তো একই। একটা ইংরেজি আর একটা বাংলা।

'না তো, হয়নি। আমি বাগ বলেছি গো বাঘ নয়।'

এবার ফড়িংবিবি তার ডানা নাড়াতে লাগল, বলল 'এটাতো জানি না'

'শোনো তোমায় আমি বলে দিচ্ছি— বাগ হলো কাঁচপোকার ইংরেজি শব্দ। বাগ আর বাঘ শব্দ দুটো কাছাকাছি মনে হয় তো, তাই একটু খটকা লাগে। এজন্যই তো এটা মজার প্রশ্ন। আমি তোমায় আগেই বলেছিলাম যে আমিও বাগ, তুমি বুঝতে পারোনি।'

এমন মজার শব্দ শিখে ফড়িংবিবি আনন্দে লাফাতে লাগল। বলল— 'কাঁচপোকা ভাই, তুমি তো অনেক মজার পোকা, আর কী কী জানো তুমি, আমায় বলবে? আর আমায় পড়তে শেখাবে?'

'নিশ্চই বলবো ফড়িংবিবি, তুমি যখন খুশি আমার কাছে চলে আসবে। আমরা অনেক কথা বলব, আমি যা জানি তা তোমায় জানাব আর তোমায় পড়তেও শেখাব। কিন্তু এখন তুমি পালাও তো ভাই, নয়তো টুপ করে একটা পাখি তোমায় খেয়ে নিতে পারে, ওই যে দেখো এক ঝাঁক পাখি উড়ে আসছে এদিকেই। পালাও ফড়িংবিবি পালাও'

ঝট করে উড়ে গেল ফড়িংবিবি, কোথায় গেল?

কোথায় আবার, হেলেঞ্চা পাতার আড়ালে। যেখান থেকে পাখিরা ওকে দেখতে পাবে না। ❑

মধুর পরিবেশ

জাকির হোসেন কামাল

ইমলিপাতা ইলিক ঝিলিক নিমলি পাতায় ঘোর,
কোন আবেশে উঠল হেসে সূর্য রাঙা ভোর।

ভোর জেগেছে সূর্য রাঙা দোর খুলেছে বন,
দোল খেয়ে যায় স্বর্ণলতায় পিউ পাপিয়ার মন।

ভোরের বাতাস কেমন কেমন বনমোরগের ডাক,
ঝুম পাহাড়ের নিমের ডালে মৌমাছিদের চাক।

আড়মোড়া দেয় পানকৌড়ি সজাগ দুটো কান,
টিয়ের গানের সাথে ভাসে মৌরি ফুলের ঘ্রাণ।

মৌরি ফুলে বাউরি বাতাস লজ্জা পেয়ে লাল,
এসব দেখে শিস দিয়ে যায় বনশিরীষের ডাল।

ডালে ডালে আলোর নাচন ঝালর পাতে বেশ,
ঝর্ণা মেয়ের চপল চলায় কাটে না যে রেশ।

তিতির শোনায় প্রীতির কথা হাসে পারুল বন,
জারুল গাছের ফুল দেখে তার মন বড়ো উন্মন।

নাটা বনের কাঁটা ঝোপে বুনোহাঁসের ঝাঁক,
ধ্বনি শোনায় কুলুকুলু শংখ নদীর বাঁক।

আঁটিসরা পানি ছিটকি বেতস ঝোপের কাছে,
ঝিলের থেকে উঠে এসে ডাহুকমেয়ে নাচে।

ইমলিপাতা ইলিক ঝিলিক আপাং পাতাও বেশ,
খুব সকালে বনের মাঝে মধুর পরিবেশ।

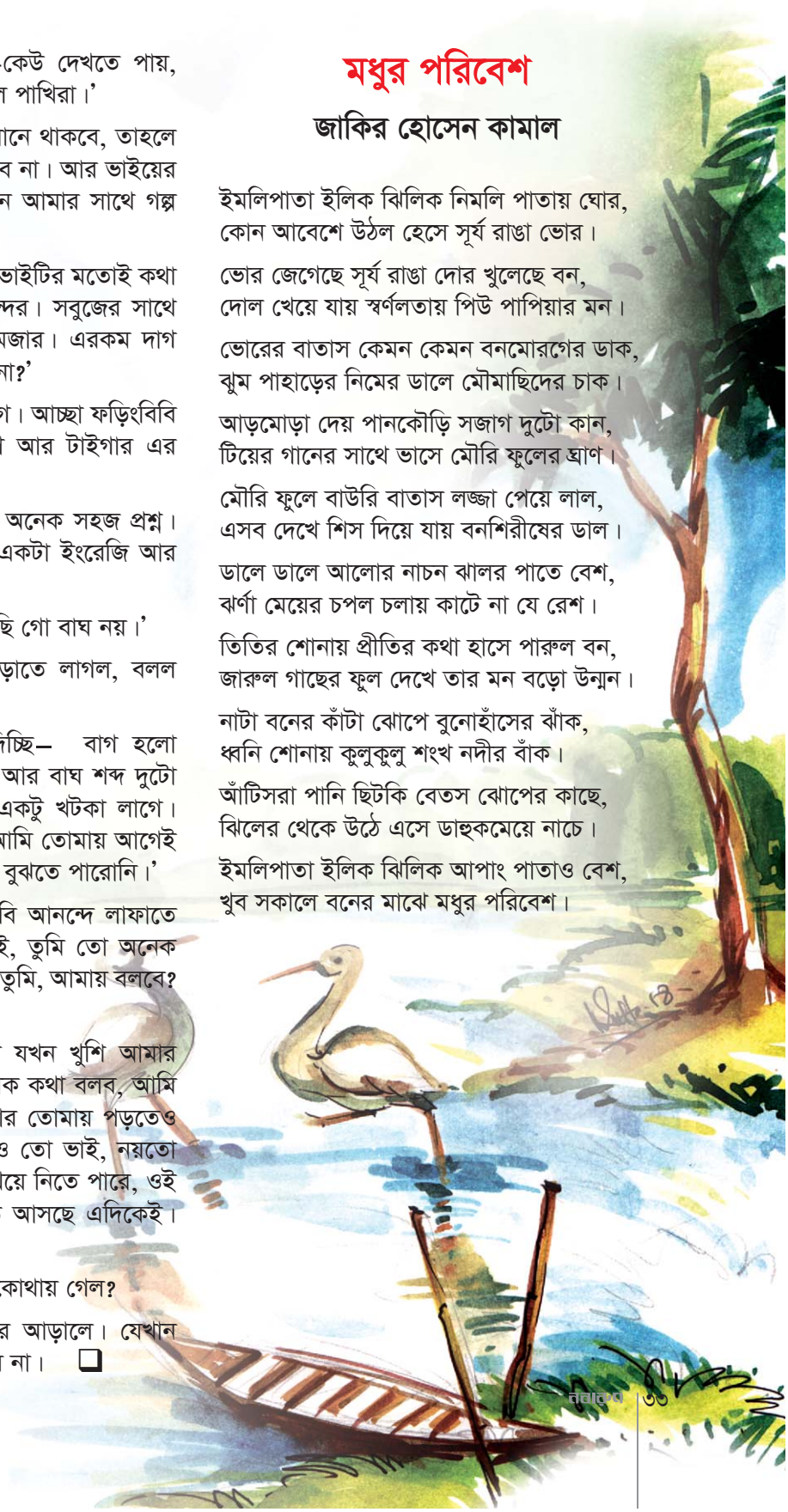

নিবন্ধ

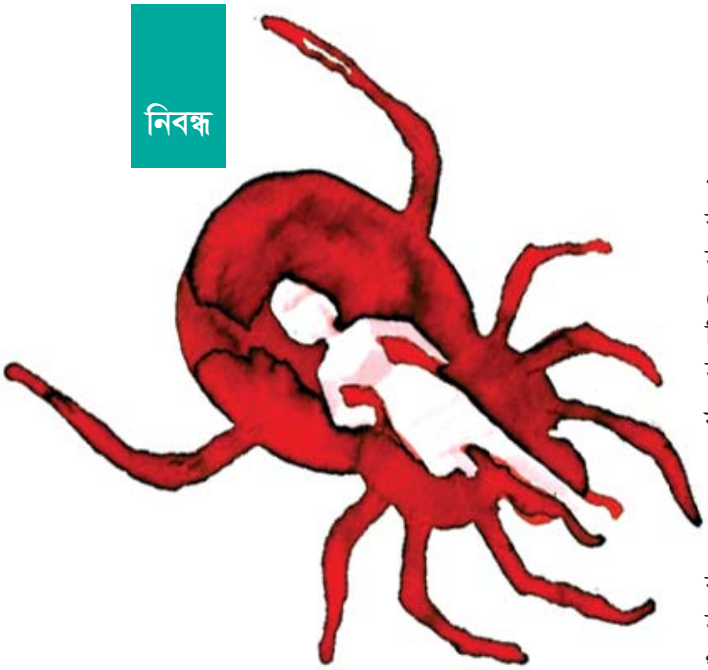

কীটপতঙ্গ নিয়ে মানুষের বিশ্বাস

নাসরীন মুস্তাফা

ঘর থেকে বেরুনোর সময় হাঁচি দেওয়া অলুক্ষণে, এটা মানুষ বিশ্বাস করে। যদিও এসব বিশ্বাস করা ঠিক না। সভ্যতা উন্নত হচ্ছে। আমরা অনেক উন্নত হয়েছি। পরিবেশের কারণে বিশ্বাসের একটু হেরফের হয়েছে, এই যা। আধুনিক মানুষের প্রতিদিনকার জীবনে প্রযুক্তি ভূমিকা রাখলেও, এখনও অদ্ভুত বিশ্বাসগুলোও পাশাপাশি বাস করছে। যদি কিছু হয়, এই ভয়ে মানুষ কিছুতেই পারে না বিশ্বাস মুক্ত হতে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এক সংস্কৃতিতে যে বিশ্বাসটি শুভ কিছুর প্রতীক, তা-ই হয়ত অন্য সংস্কৃতিতে ভয় ডেকে আনছে। কীটপতঙ্গ নিয়েও নানা মানুষের মনে আছে নানা বিশ্বাস।

কী রকম?

কীটপতঙ্গ মানেই শরীরের আধেক অংশে গিয়ে দুই ভাগে কাটা পড়েছে বলে ভাবা হয়। কাটা অংশ দু'টো সামান্য একটা কটিবন্ধনীর সাহায্যে আটকে থাকে। বোলতা এমনই তো, তাই না? মশা-মাছির মতো সাধারণভাবে চোখে পড়ে যেসব পোকামাকড়, তাদের গঠন অনেকটা এরকমই। মাঝ রাত্তিরে কানের কাছে প্যান প্যান করা মশার আর ভর দুপুরে বন মাতানো বুনো হাতি তো একই। দেখতে ছোটো আর বড়ো হলেই কি আলাদা হয়? নইলে খুব কাছ থেকে দেখে পোকামাকড়ের শরীরের কারুকাজ কেন মুগ্ধ করে শিশুকে? বড়ো হতে হতে সেই শিশুটির কেন মনে হয়, ওরা কম শক্তিশালী নয়!

কাঁকড়াবিছে

রোমান রাজা সিজারের সমসাময়িক লেখক ডায়োফেনস আরো আগের লেখকদের লেখা থেকে সংগ্রহ করে এই পোকাটি সম্বন্ধে নানান বিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যেমন, কাঁকড়াবিছে নিয়ে হাতের তালুতে পিষে মারলে তার আর কোনো ভয় থাকবে না, পোকাটিকে পুড়িয়ে মারলে পাখির মতো উড়ে যাওয়া যাবে, তেলের ভেতর পোকাটি রেখে জ্বাল দিয়ে সেই তেল পোকার হুল ফোটানো জায়গায় ঘষলে ব্যথা চলে যাবে।

পারসিয়ানরা বিছার কামড় থেকে বাঁচার জন্য স্পেশাল প্রার্থনা করত। এখনো ঐ এলাকার মানুষ কাউকে অভিশাপ দিতে হলে বলে, ও যেন বিছার কামড় খায়। ইরানে প্রচলিত একটি উপকথা এরকম– একবার এক বিছা কয়লার স্তূপে আটকা পড়ে যায়। বের হতে না পেরে মরিয়া হয়ে নিজেই নিজেকে কামড়াতে থাকে, যতক্ষণ না এর মৃত্যু ঘটে। অথচ এই কাঁকড়াবিছেদের ধরে মজা করে খায় হাইডাসপিস নদীর ধারে বাস করা ইথিওপিয়ানরা। চিকিৎসার অংশ হিসেবে এ কাজ করা হয়। ১৮৩৯ সালে লেখা লুতফুল্লাহ্ নামের এক ব্যক্তির আত্মজীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, মূত্রথলির পাথর সরানোর চিকিৎসায় কাঁকড়াবিছে পুড়িয়ে এর ছাইকে কাজে লাগানো হয়। বহু বছর ধরে নাকি এই চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন লুতফুল্লাহ্।

উই পোকা

আফ্রিকার হটেনটট'রা ফুটানো পানির ভেতর উইপোশা ফেলে ওদের শিশুদেরকে খাওয়ায়। শিশুরা মোটাতাজা হয়ে যায় নাকি এটা খেলে। ইস্ট ইন্ডিজের বুড়োরা বিশ্বাস করে, রানি উই পোকা খেলে বুড়োদের শরীরে তরুণদের মতো শক্তি চলে আসা অসম্ভব নয়।

গুবরেপোকা

ইংল্যান্ডের শিশুরা লেডি বার্ডকে ব্যথা দিয়ে ফেললে ভয় পায়। এই অভিশাপে যদি বৃষ্টি শুরু হয়! ইংল্যান্ডের প্যাঁচপেচে বৃষ্টি কি ওদের ভালো লাগে?

লেডি বার্ড খেলে নাকি শূলবেদনা, হাম ইত্যাদি রোগ সেরে যায়। উত্তর ইউরোপে এরকম বিশ্বাস আছে, বসন্ত কালে কম বয়েসি কোনো মেয়ে যদি লেডি বার্ড দেখে, তাহলে তার কপাল খুলে যায়। মেয়েটা তার হাত মেলে দেয়। মেলে দেওয়া হাতের উপর গুবরে পোকাটি টুকটুক করে হাঁটে। তখন মেয়েটা বলে, 'আমার বিয়ে হবে কোথায়, কত দূরে, সেই দূরত্বই মাপছে ও'।

মাকড়সা গুবরে বা Spider beetle (বৈজ্ঞানিক নাম Ptinidae) মৃত্যু পর্যবেক্ষক বলেই পরিচিতি পেয়েছে। জ্ঞানী লোক ব্রিটিশ লেখক স্যার থমাস ব্রাউন পর্যন্ত দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন, মাকড়সা গুবরে মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়।

উকুন

উকুন নাকি মিষ্টি মাথায় থাকে। সুইডিশ ফটোগ্রাফার গ্যাব্রিয়েল কাজ বলেছিল, তার নিজের শহর হার্ডেনবার্গে দাড়িওয়ালা ভদ্দরলোকরা মজার একটা খেলা খেলে। গোল টেবিলের উপর নিজেদের দাঁড়ি বিছিয়ে রাখে, টেবিলের মাঝখানে একটা উকুন রেখে দেখে কার দাড়িতে ঢোকে ওটা। যার দাড়ি উকুনের দখল পাবে, সে নাকি পরের বছরই এলাকার শাসক হতে পারবে।

স্যামুয়েল পুরচার্স-এর লেখা *পুরচার্স'স পিলগ্রিমস* বই থেকে জানা যায়, স্প্যানিশদের মাথা আর শরীরে চড়ে উকুন গেছে নানান দেশে। *হিস্টরি অব অ্যানিমেলস* বইতে জোহান হেনরিক শ্রোডার লিখেছেন, জন্ডিস থেকে বাঁচার বিশ্বাসে উকুন খায় অনেক দেশের অশিক্ষিত মানুষরা।

ঘাসফড়িং

প্রাচীন এথেন্সে ঘাসফড়িং ছিল সম্মানিত কীটপতঙ্গ। সন্ধ্যা কিংবা রাতে এই পোকাটিকে ঘরের ভেতর উড়তে দেখলে ধরে নেয় বাড়িতে প্রাচীন গ্রিসে ঘাসফড়িং করা হতো একে বাড়বে। থাইল্যান্ডে ঘাসফড়িং মচমচে ভেজে খুব মজা করে খাওয়া হয় এখনও।

ঘাসফড়িং-এর শরীর থেকে বের হওয়া কালো তরলটির নাম সেম্মি অথবা সেবি। এর নাকি ঔষধি গুণ আছে, আর তাই জাপান এবং চীনের ঔষধি দোকানে বোতলে ভরে বিক্রি হয়। সাপে কাটলে সাপের বিষ নামাতে সেম্মি বা সেবি নাকি দারুণ কাজের, প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসক পেডানিয়াস ডিওসকোরিডেস বলে গেছেন।

ছারপোকা

ব্রিটেনের রানি আর রাজপরিবারকে ছারপোকার কামড় থেকে বাঁচাতে ছারপোকা-ধ্বংসকারীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৬৯৫ সালে মেসার্স টিফিন অ্যান্ড সন কি উপাধি পায়, শুনলে অবাক হতে হবে। 'বাগ-ডেস্ট্রয়ার টু হার ম্যাজেস্টি অ্যান্ড দ্য রয়্যাল ফ্যামিলি'।

মেসার্স টিফিন অ্যান্ড সন কোম্পানি বংশ পরম্পরায় রাজপ্রাসাদের ছারপোকা মেরে আসছিল। কোমরবন্ধনীতে তলোয়ার ঝুলিয়ে আর মাথায় চওড়া হ্যাট পরে ছারপোকা মারতে বের হওয়ার রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেল। রাজপ্রাসাদে ছারপোকা মেরে খুব সুনাম হয়েছিল কোম্পানিটির। ফলে অভিজাত পরিবারে ডাক পড়ত এদেরই। ১৫০ বছর ধরে চলেছে এ ব্যবসা। সাধারণত বসন্তকালে ছারপোকা দমনে বের হতে হতো, জুন মাসের আগেই, অর্থাৎ পোকাটির ডিম পাড়ার আগেই আসবাবপত্রে ঔষুধ ছিটাতে হতো।

আগেকার মানুষরা কী করত না করত, ভেবে বসে থাকলে কী চলবে? ছারপোকা-

বিশ্বাসের আধুনিক রূপটি কি খুব বেশি বদলে গেছে? ওহিও'র গ্রামের মানুষরা সাধারণ জ্বর আর ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষুধ হিসেবে ছারপোকার উপর ভরসা করে। ম্যালেরিয়া জ্বর সারিয়ে তোলার ক্ষমতা ছারপোকার আছে, এমন বিশ্বাস ছিল থমাস মফে'রও।

ঝিঁঝি পোকা

চার্লস ডিকেন্স লিখেছেন 'The Cricket on the Hearth', অর্থাৎ উনুনের উপর ঝিঁঝি পোকা নামের একটি দারুণ রূপকথা। তিনি কিন্তু ঝিঁঝি পোকাকে 'লক্ষ্মী' হিসেবে দেখিয়েছেন। লিখেছেন, 'এ অবশ্যই সৌভাগ্য আনবে, জন! এ সবসময়ই তা-ই আনে। উনুনের উপর একটি ঝিঁঝি পোকা থাকা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ভাগ্যের একটি।'

আমেরিকানরাও তা-ই বিশ্বাস করে। বিশেষ করে ম্যারিল্যান্ড আর ভার্জেনিয়াতে ঝিঁঝি পোকা সুখবর বয়ে নিয়ে আসার বিশ্বাসটি খুব পোক্ত। ভুল করেও কেউ যদি একটি ঝিঁঝি পোকা মারে, তবে দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া তার উপরে পড়বেই। বাড়ি থেকে ঝিঁঝি পোকাকে বের হতে দেখলে বুঝতে হবে, বাড়ির ভেতরের পরিবেশটা অসুস্থ, ঝাড়পোছ করে ঠিক করতে হবে। আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, ঝিঁঝি পোকা গাদা খানেক ধরে চিপে-পিষে পানিতে ফুটিয়ে এক গ্লাস পানীয় তৈরি করে ঢক ঢক করে খেয়ে নিলে চমৎকার গানের গলা পাওয়া যাবে।

জোনাকি পোকা

জোনাকি পোকা মারতে নেই। এতে নাকি হত্যাকারীর ঘরের বাতি নিভে যাবে চিরতরে। এই বাতি নিভে যাওয়া মানে এলইডি লাইট ফিউজ হওয়া নয়। সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি উবে যাবে। যদিও ম্যারিল্যান্ডের বাসিন্দারা বিশ্বাস করে এর উলটো। জোনাকি পোকা খোলা দরজা বা জানালা দিয়ে উড়ে উড়ে ঘরে ঢুকলে বাড়ির সবচেয়ে বয়স্কজন শীঘ্র মারা যাবেন। রোমান লেখক প্লিনি জোনাকি পোকা সম্বন্ধে লিখেছিলেন, যখন জোনাকি পোকা দেখা যায়, তখন বার্লি, ভুট্টা আর পাকার সময় হয়েছে বুঝতে হবে।

পিঁপড়া

পিঁপড়া সারি বেঁধে চলছে, বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পিলপিল করে হেঁটে যাচ্ছে দেখলেই বুঝে নিতে হবে বৃষ্টি হবে। রেড ইন্ডিয়ান বুড়োরা বিশ্বাস করে বলে, ঘরের দরজায় যদি পিঁপড়েকে বাসা বানাতে দেখ তবে বুঝবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হচ্ছে। তাঁবুর ভেতর পিঁপড়ে ঢুকলে খুশিতে লাফিয়ে ওঠে ওরা। সৌভাগ্য এসে যাচ্ছে, পিঁপড়ে যেন সেই খবরই বয়ে এনেছে পিঠে করে। গ্রিকরা পিঁপড়ের লক্ষণ দেখে সুসংবাদ প্রচার করত। কেন করত? কৃষির দেবতা সেরেসের লক্ষণ আছে এর ভেতর, বলবে না-ই বা কেন?

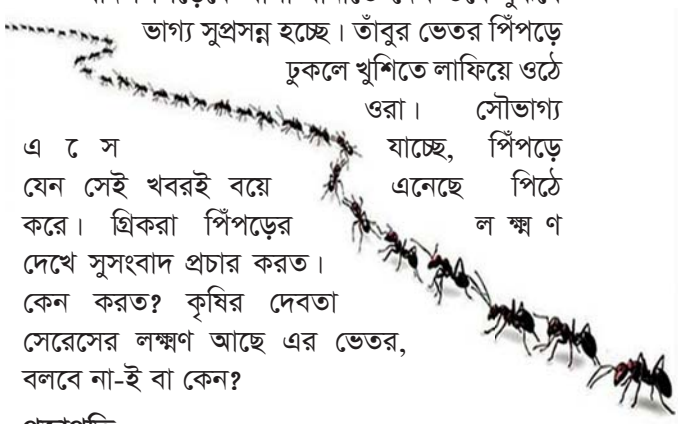

প্রজাপতি

উড়তে উড়তে যদি কোনো প্রজাপতি ক্লান্ত হয়ে যায় আর কারো কাঁধে এসে বসে, তবে হু হু করে কেঁদে ওঠা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। অনেক দেশেই এরকম বিশ্বাস আছে, প্রজাপতি কাঁধে এসে বসা মানে দুঃখের দিন শুরু হওয়া। আর কেউ যদি ভুলক্রমে প্রজাপতি মেরে বসে, তবে সামনের বারো মাসের ভেতরই তার মৃত্যু ঘটবে, এতে নাকি কোনো ভুল নেই। কালো প্রজাপতি হলে তো বিপদ আরো বেশি। অন্য প্রজাপতির প্রভাব থেকে রেহাই মিললেও কালো প্রজাপতির ডেকে আনা মৃত্যু থেকে রেহাই মিলবে না। রাতচরা এই কালো পতঙ্গটি অশুভ ইঙ্গিতবাহী।

প্রজাপতি কেন রঙিন জামা পরে নেচে নেচে বেড়ায়, তা জানতে প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম উদগ্রীব ছিলেন। তিনি কি জানতেন মিশরীয়দের প্রজাপতি বিষয়ক বিশ্বাসটা কী? মিশরীয় বিশ্বাস হচ্ছে, প্রজাপতি মানুষের আত্মা বহন করে। কোন্ মানুষের আত্মা? ফুটফুটে সুন্দর মেয়েশিশুর আত্মা, যে মৃত্যুর পর সুন্দর ডানাওয়ালা প্রজাপতি হয়ে মনের সুখে নেচে

বেড়াচ্ছে। প্রজাপতি হওয়ার আগে ও যে শুঁয়োপোকার কফিনে মৃত্যুর স্বাদ নিয়ে এসেছে।

ব্রিটিশদের মৃত্যুভয় খুব বেশি কি? তা না হলে প্রজাপতি উড়ে বাড়িতে এলেও কেন মনে করে, এ মৃত্যুর সংকেত? তবে মাথার একটু উপরে উড়তে থাকলে সৌভাগ্য আসবে বলে বিশ্বাস আছে পেনসিলভানিয়া আর মেরিল্যান্ডে। গ্রীষ্মের শুরুতে যে প্রথম ধরতে পারবে প্রজাপতি, তার সময় ভালো কাটবে। এ বিশ্বাস নিউইয়র্কবাসীদের।

কথা হচ্ছিল লেখক বর্ণালী চৌধুরী'র সাথে। বললেন, 'আমার মা কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে ঘরে বড়ো প্রজাপতি (মথ) এলে খুব খুশি হয়ে বলতেন, দেখো দেখো, ঘরে লক্ষ্মী এসেছে।'

মাকড়সা

নেটিভ আমেরিকানদের বিশ্বাস, তাঁবুর ভেতর মাকড়সার জাল দেখা গেলে বুঝতে হবে, তাঁবুর বাসিন্দাদের ভেতর ভাব-ভালোবাসা নেই। বয়স্করা এখনো বলেন, হাত-পা কেটে গেলে মাকড়সার জাল কাটা জায়গার উপর বসিয়ে দিলে দ্রুত সেরে যায়।

নেদারল্যান্ডে মাকড়সা সকালে দেখা দিলে সৌভাগ্য আর সন্ধ্যায় দেখা দিলে দুর্ভাগ্যের নিশানা। লাল রঙের ছোট্ট এক ধরনের মাকড়সা দেখা যায় ইংল্যান্ডে, এর সারা শরীরে নাকি বিষ আছে। গরু বা ঘোড়ার যদি বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়, ব্রিটিশরা ভাবতে থাকে, ঐ মাকড়সাটাই কামড়ালো না তো!

মাটির উপর এই জাল বেছানো থাকলে বুঝতে হবে, ফসল বোনার সময় হয়েছে। এই বিশ্বাস আছে স্কটল্যান্ডের কৃষকদের। জার্মানরা ভাবে, মাকড়সার জাল আসলে বামনরা বুনে দেয়।

মাছি

মাছিকে কেউ পছন্দ করে না। মাছির পক্ষে কোনো কথা কোনো সংস্কৃতিতে আছে বলে জানা নেই। মানুষ আর পশুকে তো বিরক্ত করেই, মৃতদেহকেও শান্তি মতো ঘুমাতে দেয় না হতচ্ছাড়ার দল। থমাস মফে তাঁর লেখা *থিয়েটার অব ইনসেক্টস* বইয়ে লিখেছেন, প্রকৃতির বহুরূপী খেলার অনেক উপায়ের একটিতে মানুষের স্বপ্নে মাছি পর্যন্ত পাঠানো হয়। ভারতীয়রা, পারস্যবাসীরা আর মিশরীয়রা শেখে, স্বপ্নে যদি কেউ মাছি দেখে, তবে কিছুদিনের মধ্যে রোগে পড়বে। ব্রিটেনের গ্রামগঞ্জে মাছি স্বপ্নে এলে শত্রুর দেখা মিলবে জাতীয় বিশ্বাস আছে। ঘরে অনেক মাছি মরে থাকলে ঘরের বাসিন্দাদের কারোর মৃত্যু ঘটবে। আর গোটা দেশে এমন ঘটলে কী হবে? যে বছর মাছি বেশি দেখা যায়, সে বছর প্লেগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জেগে মাছি দেখলে কী হবে? স্কটল্যান্ডের গভীর সমুদ্রের জেলেরা বিশ্বাস করে, পানির গ্লাসে পানি খাওয়ার ঠিক আগে আগে যদি মাছি গিয়ে বসে, তবে পানি পানকারীর সৌভাগ্য আসছে।

মৌমাছি

গ্রিকরা মৌমাছিকে সুবক্তা হওয়ার লক্ষণ বলে মনে করত। মৌমাছি উপকারী পতঙ্গ, এ হচ্ছে গ্রিক-বিশ্বাস।

ইংল্যান্ডের দক্ষিণ নর্দাম্পটনশায়ারে এমন বিশ্বাস আছে, যে বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি বেশি, সেখানে মৌমাছি আসে না। যুদ্ধ-বিবাদে মৌমাছির কাজের ক্ষমতা কমে যায় বলেই এমনটি ঘটে।

১৮০২ সালে প্রকাশিত জর্জ ভগান স্যাম্পসনের লেখা *স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভে অব দ্য কান্ট্রি অব লন্ডনডেইরি* বইয়ের ৪৩৬ নম্বর পৃষ্ঠাতে যা লেখা আছে, তার বাংলা অনুবাদটা এরকম, 'মৌমাছি বিক্রি করা যেতে পারে, তবে তাড়িয়ে দেওয়া ঠিক না; এরকম হলে কারোরই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে না।'

মৌমাছিকে গরম পানিতে ছেড়ে দিয়ে সেই পানিতে চা বানিয়ে পান করলে শরীর বিষমুক্ত হওয়ার বিশ্বাসটা এই কালেরই। বিশ্বাস না হলে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ঔষধ 'এপিস' কী দিয়ে বানানো খোঁজ নিয়ে দেখ তো, সেটা মৌমাছির বিষ কী না!

সুন্দর কীট সুন্দর পতঙ্গ

কমলেশ রায়

তোমরা তাহলে ভেতরে যাও। ঘুরে দেখে আসো। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। হাতে টিকিট ধরিয়ে দিয়ে লিটু স্যার গড়গড় করে বললেন।

নিধা আর সমু মাথা নেড়ে সায় দিল। প্রায় একই সঙ্গে বলল, ঠিক আছে স্যার।

কীটপতঙ্গ পার্কের প্রধান ফটক। সকাল সোয়া নয়টায়ই দীর্ঘ লাইন। শিশু-কিশোররা ভেতরে যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকের পরনে ঝলমলে পোশাক। সবার সঙ্গেই তাদের অভিভাবকরা এসেছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে খাবার ও পানীয় হাতে। শুধু নিধা আর সমুর বেলায় ব্যতিক্রম। তাদের গায়ে স্কুলের পোশাক। এসেছে স্যারের সঙ্গে।

মহাগড় নগরের এই পার্কে জীবনে প্রথম এল তারা। তাদের স্কুলে বার্ষিক কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় যারা হয়, তাদের নিয়ে আসা হয় এই পার্ক দেখাতে। এবার প্রথম হয়েছে নিধা। আর সমু দ্বিতীয়। দুজনের মা-বাবাই সন্তানের এই সাফল্যে খুব খুশি হয়েছেন।

পাথুরে ছোট্ট একটা শহর। নাম সালগা। ওই শহরে কোনো গাছ নেই, লতা নেই, গুল্ম নেই। কীটপতঙ্গও নেই। সেখানে একটাই স্কুল। নাম দীপালোক বিদ্যালয়। এই স্কুলে নিধা পড়ে পঞ্চম শ্রেণিতে। সমু সপ্তম শ্রেণিতে। সন্ধ্যার আগেই তারা ট্রেনে করে আবার প্রিয় শহর সালগায় ফিরে যাবে। রেল স্টেশনে নিধার মা ও বাবা আসবে তাকে নিয়ে যেতে। সমু যাবে স্যারের সঙ্গে। কারণ তারা একই পাড়ায় থাকে। স্যার ওকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

এই পার্ক শুধু শিশু-কিশোরদের জন্য। বড়োরা এখানে ঢুকতে পারে না। ভেতরে ঢুকতেই ওদের দিকে এগিয়ে এল একটা ছেলে। বয়স সমুর কাছাকাছি।

বেশ চটপটে। সে এসেই বলল, আমার নাম রিকি। তোমাদের টিকিট নম্বর কি ১৫১ আর ১৫২ ?

হ্যাঁ। সমু বলল। নিধা সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

আমি তোমাদের গাইড। রিকি হেসে বলল। সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কী নাম তোমাদের ?

সমু তার নাম বলল। নিধা জানাল নিজের নাম।

পরিচয় পর্ব শেষ হতেই রিকি বলল, চলো তাহলে এক দিক থেকে শুরু করা যাক।

প্রথমেই ওরা গেল প্রজাপতি উদ্যানে। হরেক রকম গাছ। গাঢ় সবুজ পাতা। রঙিন সব ফুল। প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ছে। ডালে ডালে, পাতায় পাতায় বসছে। কত রকম প্রজাপতি। কত রঙের ডানা। কী রঙিন সব পাখা। কী রঙিন একেকটা প্রজাপতি। নিধার মন ভরে গেল। সমু তো পারলে চোখের পলকই ফেলছে না। দুষ্টু একটা ছেলে রঙ্গন ফুলের গাছটাকে ধরে ঝাঁকুনি দিল। একসঙ্গে উড়াল দিল অনেকগুলো প্রজাপতি। দৃশ্যটা দেখে মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল কয়েকজন ছেলেমেয়ে।

তোমরা কী জানো, প্রায় ২৮ হাজার প্রজাতির প্রজাপতি আছে ? দুই থেকে চার সপ্তাহ বেঁচে থাকে এরা। সাধারণত তরল খাবার যেমন-মধু খেয়ে এরা বেঁচে থাকে । শীতকালে প্রজাপতিদের উড়তে বেশ কষ্ট হয়। কারণ উড়তে ৮৬ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় তাদের। রিকি গড়গড় করে বলল কথাগুলো।

নিধা বিরক্ত হলো রিকির ওপর। তথ্য তো চাইলেই জেনে নেওয়া যাবে। এখন গড়গড় করে তথ্য বলে দেখার আনন্দকে মাটি করার কোনো মানে হয় না। মুখে অবশ্য সে রিকিকে কিছু বলল না।

তুমি দেখছি কবিতার মতো করে তথ্য মুখস্থ করেছ। ভালো, বেশ ভালো। সমু মুচকি হেসে বলল।

রিকি বুঝতে পারল বিষয়টা। গাইডকে এসব গায়ে মাখলে চলে না। সে বলল, এগুলো তোমাদেরকে জানানো আমার কর্তব্য।

সেটা আমরা জানি। চলো, আজ কথা কম বলে মন ভরে কেবল দেখি। মিষ্টি করে হেসে নিধা বলল।

এরপর সত্যি রিকি আর কোনো কথা বলল না। প্রজাপতি উদ্যানে ওরা অনেকটা সময় কাটাল। প্রজাপতির পেছনে ছুটল। ঘুরে ঘুরে উপভোগ করল সুন্দর এই পতঙ্গের সীমাহীন সৌন্দর্য।

প্রজাপতি উদ্যানের পাশেই 'পিঁপড়ার পৃথিবী'। সেখানে ঢোকার আগে অন্যদের মতো তাদের তিনজনকেও গামবুট পরিয়ে দেওয়া হলো। গায়ে পরানো হলো হুডির মতো বিশেষ অ্যাপ্রোন। হাতে হাতমোজা। চোখে চশমা। যাতে পিঁপড়া কোনো ভাবেই কামড়ে দিতে না পারে। ভেতরে ঢুকে তো যে কেউ অবাক হবে। এত পিঁপড়া ! এত প্রজাতি। ছোটো-বড়ো, কালো-লাল। পিলপিল করে ছুটছে। কিছু আবার উড়ছে। সমুর মনে পড়ল বিশেষ একটা লাইন, 'পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে।'

রিকি মুখ খুলতে যাবে, ঠিক তখনই নিধা বলল, গড়গড় করে আর একগাদা তথ্য বলবে না। পিঁপড়া নিয়ে বলতে চাইলে মজার তিনটা তথ্য বলো। শুধু মজার হলেই হবে না, এগুলো যেন আমাদের কাছে নতুন তথ্য মনে হয়। কারণ পাঠ্য বই থেকে আমরা পিঁপড়া সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি।

রিকি, শর্ত কিন্তু দুটো। তিনটে মজার তথ্য এবং সেগুলো হতে হবে নতুন। কী পারবে না ? সমু বলল।

রিকি মাথা চুলকে বলল, দেখি চেষ্টা করে।

এক. পিঁপড়া তার শরীরের চেয়ে ২০ গুণ বেশি ওজন বহন করতে পারে

দুই. কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড়ের মধ্যে পিঁপড়া সবচেয়ে বড়ো মস্তিষ্কের অধিকারী

তিন. এদের আয়ু সাধারণত ২৮ বছর। এটা আমরা কমবেশি অনেকেই জানি। তবে এরা পানির তলদেশে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

নিধা বলল, ঠিক আছে। খুশি হয়েছি। ইচ্ছে করলে আরেকটা তথ্য বলতে পারো।

রিকি বলল, পিঁপড়ার পেট দুটো। একটিতে নিজের জন্য খাদ্য জমা রাখে। অন্যটিতে খাদ্য রাখে অন্যের জন্য।

শাবাশ রিকি। সমু পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল। এরপর প্রশ্ন করল, পাখা হয় কোন পিঁপড়ার ?

রানি পিঁপড়ার। এই রানি পিঁপড়া কিন্তু ৩০ বছরের বেশি বাঁচে। যার থেকে লক্ষাধিক বাচ্চা হয়। রিকি আনন্দের সঙ্গে বলল।

ব্যাস ! সুযোগ পেলেই গড়গড় করে তথ্য বলে দেবে। নিধা হেসে বলল।

সমু আর রিকিও ওর বলার ধরনে হেসে ফেলল।

'পিঁপড়ার পৃথিবী' ঘুরে দেখে এরপর ওরা গেল 'ফড়িংয়ের রাজ্যে'। তিড়িংবিড়িং করে উড়ছে ফড়িং। কাঁটাযুক্ত গাছে বসছে অনায়াসে, আবার উড়ছে। সাধারণ গাছের ডালে ও পাতায় ছয় পা দিয়ে আয়েশ করে বসে তাকিয়ে দেখছে চারপাশ। এদের বড়ো মাথাটাকে ইচ্ছেমতো যেদিকে খুশি ঘুরানোর ক্ষমতাটা সত্যিই দেখার মতো। লতাপাতার মধ্যে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ঘাসফড়িং। একটা তো জোরে লাফ দিয়ে পাশের ঘাসের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

ফড়িং আর ঘাসফড়িংয়ের মধ্যে পার্থক্যটা কী ? সমু প্রশ্ন করল। এবার আর রিকির আগে মুখ খুলতে হয়নি।

দেখতে তো দুটো দুরকম। সবচেয়ে বড়ো কথা ঘাস ফড়িং ঘাস, পাতা, শস্যের কচিপাতা খায়। আর ফড়িং কিন্তু শিকারি এবং প্রাণী খেকো। এরা মশা, মাছি, পিঁপড়া, মৌমাছি ও প্রজাপতিকে খেয়ে বেঁচে থাকে। রিকি বলল।

তারমানে ঘাসফড়িং নিরামিষভোজী। নিধা বলল।

রিকির কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে। সমু বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে বলল।

ফড়িংয়ের রাজ্য থেকে বের হলে বাঁ দিকে একটা মেঠো পথ। সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার সময় ভেসে এল ঝিঁঝি পোকার ডাক। একটু সামনে গেলে সহজেই সবার চোখ আটকে যায়। ডানে মাটির বেশ উঁচু একটা স্তূপ, তাতে আবার খাঁজও চোখে পড়ছে।

ওটা কী? নিধা জিজ্ঞেস করল।

উই পোকার ঢিবি। রিকি বলল।

এত বড়ো! এ যে পাহাড়ের ছোটো সংস্করণ। সমু অবাক হয়ে মন্তব্য করল।

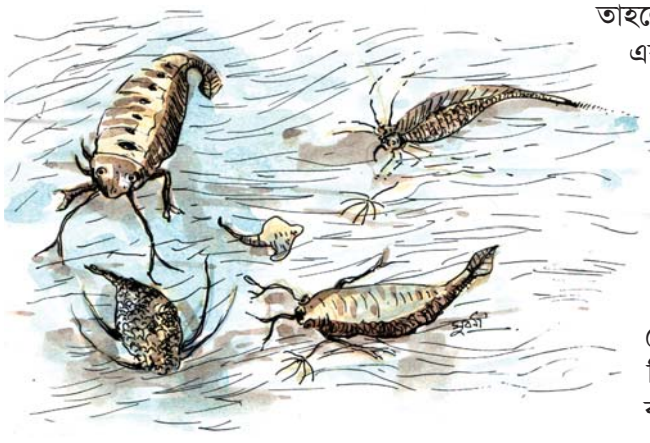

সর্বনাশ, বাঁচতে চাইলে তোমরা দৌড় দাও। রিকি পশ্চিম দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখে নিল, তারপর দৌড় দিল। গুনগুন জাতীয় একটা শব্দ ভেসে আসছে।

কী হয়েছে ? সমু রিকির পিছু দৌড়াতে দৌড়াতে জিজ্ঞেস করল।

মৌমাছির শব্দ কী ? আমি একটা সিনেমায় এমন শব্দ শুনেছিলাম। নিধা বলল। সেও দৌড় দিয়েছে।

কেউ মনে হয় মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছে। তোমরা জোরে দৌড় দাও। আমাদেরকে সামনের ওই ছোট্ট ঘরে ঢুকতে হবে। রিকি ছুটতে ছুটতেই বলল।

সামনে ছোট্ট ছোট্ট অনেকগুলো ঘর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আরো অনেকে দৌড়ে এদিকে আসছে। সবচেয়ে কাছের ঘরটাতে ঢুকল রিকি। তার পেছন পেছন সমু আর নিধা। রিকি দরজা আটকে দিলো। একবারেই ছোট্ট ঘর। আয়তনে বড়ো জোর টং ঘরের মতো। জানালা ও দরজায় সিনথেটিক জাল লাগানো। জালের ক্ষুদ্র ফোকর দিয়ে চাইলেই মৌমাছি ভেতরে ঢুকতে পারবে না। তখন বাইরে থেকে কেবল গুনগুন করাই সার।

তিনজনই হাঁপাচ্ছে। কিছু মৌমাছি জানালার জাল পার হয়ে ভেতরে আসতে চাইছে। পারছে না। রাগে হয়ত গুনগুন করছে বেশি করে। নিধা বলল, বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছি। সে মেঝেতে বসে পড়েছে। সমু আর রিকিও তার দেখাদেখি বসল।

কত সময় বন্দি থাকতে হবে ? সমু জিজ্ঞেস করল।

কপাল খারাপ হলে আধাঘণ্টা। রিকি জবাব দিল।

নিধা মন খারাপ করে বলল, ধ্যাৎ, তাহলে তো হয়েই গেল। একটু পরে তো আমাদের চলেই যেতে হবে।

কোথায় যাবে? রিকি বলল।

কেন, আমাদের শহরে। আমাদের বাড়িতে।

তোমাদের কত মজা। নিজের শহর আছে, বাড়ি আছে। মন খারাপ

করা গলায় বলল রিকি।

কেন তোমার বাড়ি নেই ? সমু বলল।

না, নেই।

বাড়ি নেই ! কী বলছো আবোল-তাবোল। নিধা অবাক হলো।

ঠিকই বলছি। বাড়ি থাকবে কী করে ? মা-বাবাই তো নেই। রিকি ধরা গলায় বলল।

কী বলছো, মা-বাবা নেই ? রিকির পিঠে হাত রেখে বলল সমু।

এতিমদের কী মা-বাবা থাকে ?

তুমি তাহলে থাকো কোথায় ? নিধা আন্তরিক গলায় জিজ্ঞেস করল।

এই পার্কেই থাকি। আমার মতো আরো কয়েকজন এতিম এখানে আছে, আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি। রিকি চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল।

ওরাও কী তোমার মতো গাইড ? সমু বলল।

হ্যাঁ। এই কাজের বিনিময়েই আমরা খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক আর শিক্ষা পাই।

কোথায় কখন পড়ো তোমরা ? নিধা বলল।

এখানেই রাতের স্কুলে পড়ি।

আরে, দ্যাখো, এরই মধ্যে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সমু গলায় বিরক্তি ফুটিয়ে বলল।

ব্যাস! তাহলে তো বড়ো ঝামেলায় পড়া গেল। এখনকার বৃষ্টি তো সহজে থামে না। রিকি কথাগুলো বলে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল।

আমাদের মনে হয় কপালই খারাপ। প্রথমে মৌমাছির ধাওয়া, তারপর এই বৃষ্টি। নিধা ঠোঁট উলটিয়ে বলল।

তোমাদের কপাল তো অনেক ভালো। তোমরা বাইরের কত কী দ্যাখো। রিকি বলল, তার মুখে ম্লান হাসি।

তুমি বুঝি বাইরে গিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকো। সমু বলল।

আমি তো কখনো এই পার্কের বাইরেই যাইনি।

চাপা মারছো। ভাবছো, তুমি বললেই আমরা বিশ্বাস করব।

আমি মোটেও চাপা মারছি না। যেটা সত্য, সেটাই বলছি। রিকি দৃঢ় গলায় বলল। এক ধরনের বিষণ্নতায় ভরা তার গলা।

তুমি কী বাইরে যেতে চাও ? তাহলে আমাদের সঙ্গে চলো। নিধা বলল।

হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে চলো। আমি তোমাকে আমাদের পুরো শহর ঘুরিয়ে দেখাব। সমুও অনুরোধ করল রিকিকে।

এই বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হলো। প্রথমে গাইগুই করলেও পরে সালগা যেতে রাজি হলো রিকি। তার মুখে খুশি উপচে পড়ছে। বাইরে তখনো বৃষ্টি পড়ছে। কখন থামবে ঠিক নেই। এদিকে সবারই বেশ ক্ষুধা পেয়েছে। কিন্তু লিটু স্যার তো নিধা আর সমুকে কোনো খাবার দিয়ে দেননি। রিকি তার ব্যাকপ্যাক থেকে ছোটো তিন প্যাকেট বিস্কুট বের করল। তারপর হেসে বলল, লাঞ্চ হিসেবে এর চেয়ে ভালো কিছু জোগাড় করা এ মুহূর্তে প্রায় অসম্ভব। দ্যাখো, চলবে কিনা?

খুব চলবে। প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠল সমু আর নিধা।

রিকির কাছে পানির বোতলও ছিল। বিস্কুট খাওয়ার পর তারা পানি খেল। তিনজনে এরপর আরো অনেক গল্প করল। কথায় কথায় রিকি জানাল, এরপর এলে একদিন অন্তত সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হবে। দক্ষিণের ঝোঁপটার কাছে নিয়ে গিয়ে জোনাকির আলো দেখাবে সে।

নিধা আর সমু দুজনেই তার কথায় মাথা নাড়ল। সময় নিয়ে আসবে একদিন।

বৃষ্টি যখন থামল তখন বিকেল চারটেরও বেশি। আর অপেক্ষা করা যাবে না। তাহলে ফিরতি ট্রেন মিস হয়ে যাবে। সমু বলল, রিকি এবার চলো তো। স্যার কিন্তু আমাদের জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

হ্যাঁ, চলো। রিকি উঠে দাঁড়াল।

তিনজনই ছুটল প্রধান ফটকের দিকে।

স্যার ফটকের বাইরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। সমু আর নিধাকে দেখে হাত নাড়লেন তিনি। জবাবে তারাও হাত নাড়ল।

রিকিও তাদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর কী মনে করে থমকে দাঁড়াল।

কী হলো ? চলো। সমু বলল।

তোমরা যাও। আমি আমার এই প্রিয় বাসস্থান ছেড়ে যাব না। রিকি বলে পিছিয়ে গেল, এরপর গিয়ে দাঁড়াল ফটকের ভেতরে।

লিটু স্যার এগিয়ে এলেন। তার হাতে দুটো বার্গার ও পানীয়। তিনি গড়গড় করে বললেন, কী কাণ্ড দ্যাখো তো। তাড়াহুড়োয় তোমাদের খাবার দিয়ে দিতেই ভুলে গেছি। আমার ভুলের কারণে ক্ষুধায় কষ্ট পেয়েছো তোমরা।

না, রিকি আমাদের বিস্কুট খাইয়েছে। নিধা বলল।

সমু স্যারের কাছ থেকে একটা বার্গার নিয়ে দৌড়ে গেল রিকির কাছে। তারপর সে তাকে বলল, তুমি এটা রাখো। পরেরবার যখন আসব, তখন কিন্তু তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে।

রিকি হেসে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। তার চোখ ছলছল করছে।

ছেলেটা কে ? লিটু স্যার নিধাকে জিজ্ঞেস করল।

ওর নামই তো রিকি। ও আজ আমাদের গাইড ছিল। খুব ভালো ছেলে। নিধা জবাবে বলল।

কিন্তু রিকি কেন যেতে চাইছে না ? নিধার মাথায় তখনই এই প্রশ্নের জবাব চলে এল। ফিরে এলে যদি রিকিকে আর এই পার্কে ঢুকতে দেওয়া না হয়, এই ভয়তেই ছেলেটা শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেছে। তাদের সঙ্গে সালগা যেতে চাইছে না।

আহা রে, এতটুকু বয়সেই ছেলেটা কী কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। রিকির জন্য নিধার খুব মায়া হতে লাগল।

গ্রন্থকীট

দৃশ্য এক

আদিকালের কথা। বৃদ্ধ পণ্ডিত অসুস্থ। এই সুযোগে ফাঁকিবাজ শিষ্য লেখাপড়া শিকেয় তুলে রাখল। এমনিতেও সে পাঠ্যগ্রন্থ নিয়ে খুব একটা বসতে চায় না। দীর্ঘদিন পর পণ্ডিত সুস্থ হলেন। ফাঁকিবাজ শিষ্য অনেকটা বাধ্য হয়ে যখন পাঠ্যগ্রন্থ নিয়ে বসল তখন তার মাথায় হাত। তেলাপোকা গ্রন্থটি আর পাঠযোগ্য রাখেনি। ইচ্ছে-স্বাধীন কেটেছে। ফাঁকে ফাঁকে বিষ্ঠার দানা, কালো-খয়েরি ডিম। অবস্থা দেখে বেদনাহত কণ্ঠে পণ্ডিত তার শিষ্যকে বললেন, 'শাখামৃগ কোথাকার। ভেবেছিলেম, তুই আস্তে-ধীরে একটা গ্রন্থকীট হয়ে উঠবি। এখন দেখছি তোর গ্রন্থই কীটে আর আস্ত রাখেনি।'

দৃশ্য দুই

উত্তরণকালের কথা। রাগান্বিত গৃহবধূ স্বামীগৃহ ছেড়ে পিতার বাড়িতে এসে হাজির। তিনি মেয়েকে হেতু জিজ্ঞেস করলেন। গৃহবধূ আরো রেগে গিয়ে বললেন, 'তুমি গ্রন্থকীট জামাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছো, মেনে নিয়েছি। কিন্তু তোমার জামাই যদি ঘর থেকে তার গ্রন্থের কীটগুলোকে না তাড়ায় তবে আমি আর ওমুখো হচ্ছি না।' জামাতার বাড়িতে তেলাপোকার বড্ড বাড়-বাড়ন্ত। এই অভিযোগ অনেকদিন ধরেই মেয়ে করে আসছে। তেলাপোকাকে সে ভীষণ ভয় পায়। কী আর করা, তেলাপোকা মারার ওষুধ নিয়ে জামাতার বাড়িতে হাজির হলেন তিনি। সব শুনে রসিক জামাতা বললেন, 'এই বাড়ির ওই একটা মাত্র প্রাণীকেই ভয় পেত আপনার মেয়ে। সেটাকেও জব্দ করতে চলে এসেছেন।'

দৃশ্য তিন

প্রাক আধুনিককালের কথা। ইন্টারনেটের চরম উৎকর্ষতার যুগ। কাগজের বই লোকজন বলতে গেলে পড়েই না। সবাই পড়ে 'ডিজিটাল বুক'। তেলাপোকা রাওটারের তার কেটে দিয়েছে। গ্রন্থকীট এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে বললেন, 'দেখেছো, বই না পেয়ে তেলাপোকা এখন ইন্টারনেটের তার কাটা ধরেছে। বেজায় জ্ঞানপিপাসু কীট একটা !'

দৃশ্য চার

আধুনিককাল। ইন্টারনেটের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। একটা ক্রিস্টালের মধ্যে এখন ধরে রাখা যায় বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান। তবে ছোট তেলাপোকা আকৃতির 'সার্চ মেশিন' এখনো খুঁজে বেড়ায় নতুন নতুন তথ্য। নতুন আহরিত তথ্য জমা হয় পুরানো জ্ঞান ভাণ্ডারে। ছোট্ট একটা তেলাপোকা (সার্চ মেশিন) শুড় নেড়ে খুব ভাব নিয়ে বলল, 'আমিই কিন্তু এ যুগের গ্রন্থকীট।'

স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রটি এখানেই শেষ হয়ে যায়। হল ভর্তি দর্শকের হাততালিতে কান পাতা দায়। তরুণ সমু এক তরুণীর হাত ধরে তাই হলের বাইরে বেরিয়ে এল। তরুণীটি আর কেউ নয়, নিধা। পরিচালকের রসবোধ কিন্তু প্রখর। সমু হাসতে হাসতে বলল।

তুমি কী বিশেষ কোনো দৃশ্যের কথা বলতে চাইছো? নিধা জিজ্ঞেস করল।

আরে না। তুমি একদম শেষ দৃশ্যের লেখাটা পড়নি?

হ্যাঁ, পড়েছি। মজার। সাধু ভাষায় একটা সুন্দর বাক্য।

অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা (গ্রন্থকীট) টিকিয়া আছে। হা-হা-হা।

সমু আর নিধা একটা সন্ধ্যা উপভোগ করতে এসেছে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। তারা এরপর হাত ধরাধরি করে গেল কফি শপে। ছোট্ট টেবিলে মুখোমুখি বসে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কফির স্বাদ আস্বাদন করল তারা।

কফি শপের পাশেই লেক। লেকে ভাড়ায় নৌকা পাওয়া যায়। সফটওয়্যার চালিত নৌকা। নৌকায় উঠলেই গলুইয়ের কাছে ভেসে উঠে একটা পর্দা। তাতে থাকে কিছু প্রশ্ন। কতক্ষণ থাকতে চান? নৌকায় ছই থাকবে কি না? নৌকা কত গতিতে চলবে? মাঝে-মধ্যে থামবে কি না? ইত্যাদি। প্রতিটি প্রশ্নের নিচে অনেকগুলো উত্তর দেওয়া থাকে। পছন্দের উত্তরে আঙুল দিয়ে টিক চিহ্ন দিলেই কাজ সারা। বাকি দায়িত্বটুকু নৌকা নিজেই পালন করে।

সমু আর নিধা আজ নৌকায় চড়ে লেকে অনেকক্ষণ ঘুরবে বলে মনস্থ করেছে। তাদের সঙ্গে আরো অনেকে নৌকা ভ্রমণ করছে। পাড়ের ঝোপে জোনাকিরা উড়ছে। ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। আকাশে বিশাল আকৃতির সোনালি টিপের মতো চাঁদ। নিধা আর সমু জোছনা উপভোগ করল। রাত বাড়লে তারা ফিরে গেল নিজ নিজ বাসায়। বিছানায় শুয়ে অনেক কথা ভাবল। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

গ্রন্থকীট কিন্তু অক্লান্ত। তার কোনো বিশ্রাম নেই। তার চোখে কোনো ঘুম নেই। সে কেবলই ছুটে চলে তথ্যের সন্ধানে। খুঁজতে খুঁজতে একদিন সে পেয়ে যায় শেকড়ের সন্ধান। দেখা হয়ে যায় মূল প্রোগ্রামের সঙ্গে। পিলে চমকে ওঠার মতো তথ্য।

কীটপতঙ্গ পার্ক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সবই অলীক। প্রোগ্রাম করা দুটো জগৎ। এই দুই জায়গার সবকিছুই কৃত্রিম। শুধু সমু আর নিধা ছাড়া। তারা দুজনই কেবল আসল। জীবিত এবং মানুষ।

গ্রন্থকীট অনুরোধ জানায় আরো বাড়তি তথ্যের জন্য। মূল প্রোগ্রাম তাকে জানায়, আপাতত তার কাছে এটুকু তথ্যই আছে। তবে ভবিষ্যতে হয়ত আরো বেশি তথ্য জানাতে পারবে।

গ্রন্থকীট মূল প্রোগ্রামকে বলে, 'সত্যের সন্ধানের জন্য আমি দীর্ঘ পথ চলতে এবং দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতেও রাজি।'

সত্যের সন্ধানে কেমন আছেন ? মূল প্রোগ্রাম জিজ্ঞেস করল।

ভালো। এসো, আমি তো তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। প্রোগ্রামার বললেন।

ধন্যবাদ। আমি কিন্তু আজ কিছু তথ্য জানতে চাই।

বিনা সংকোচে জিজ্ঞেস করতে পারো।

কীটপতঙ্গ পার্ক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সবকিছু কৃত্রিম এটা আমি জানি। কীটপতঙ্গ কৃত্রিম। বৃষ্টি কৃত্রিম। রিকি ও লিটু স্যার কৃত্রিম। সিনেমা হল কৃত্রিম, লেক কৃত্রিম। চাঁদ কৃত্রিম, জোছনা কৃত্রিম। জোনাকি কৃত্রিম, ঝিঁঝি পোকার ডাক কৃত্রিম...।

আহ্, তোমার মতো প্রোগ্রামগুলোর এই এক সমস্যা। গড়গড় করে শুধু বলতে থাকো। দয়া করে

বলবে তোমার প্রশ্নটা কী ? সমু আর নিধা তো আসল এবং মানুষ। তাহলে তাদের জন্ম কীভাবে আর তারা থাকে কোথায়?

দুটো প্রশ্নের উত্তর একটাই। গবেষণাগারে। জন্মও সেখানে। থাকেও সেখানে।

তাহলে তাদেরকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় কেন ? নেওয়ার দরকারটাই বা কী ?

দরকার আছে বলেই তো নেওয়া হয়। গবেষণাগারে একাধিক বয়সের একাধিক সমু ও নিধা বাস করে। তাদেরকে বিশেষ কৌশলে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। প্রত্যেকের নাকে-মুখে নল লাগানো। খাওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস ওইসব নলের মাধ্যমেই চলে। তাদের মস্তিষ্কে প্রয়োজন মতো স্মৃতি ঢুকানো হয়। নিখুঁত প্রোগ্রাম করা এইসব স্মৃতি এতটাই জীবন্ত যে তাদের কাছে মনে হয় তারা আসলেই এই জীবনযাপন করছে। তারা যাতে ঠিক মতো হাঁটাচলা শেখে, দৌড়াতে শেখে, তাদের জীবনীশক্তি যাতে বাড়ে, এরকম অনেক কারণে তাদেরকে বাইরে নেওয়া হয়। এবার বুঝতে পারলে ?

পেরেছি। সঙ্গে এও বুঝতে পেরেছি, বাইরে গিয়ে তারা কী দেখবে, কী বলবে সেটাও আগে থেকেই ঠিক করে দেওয়া হয়।

একদম ঠিক বলেছ।

একাধিক বয়সের একাধিক সমু ও নিধা কেন বলুন তো ?

কারণ আমাদের প্রতিবছর একজোড়া সমু ও নিধা দরকার। যাদের বয়স হবে কমপক্ষে বিশের ওপরে।

প্রতিবছর কেন দরকার ?

কীটপতঙ্গ উৎসবের জন্য।

ওই উৎসবে তাদেরকে কেন দরকার হয় ?

সেটা আজ নয়, আরেকদিন বলব। এখন তুমি বলো, এত সব কিছু তুমি কেন জানতে চাচ্ছো ?

একজন আমার কাছে জানতে চেয়েছে।

কে গ্রন্থকীট ?

হ্যাঁ। আপনি কী করে জানলেন ?

আমি সব জানি। আর এটাও জানি যে তুমি গ্রন্থকীটকে বাড়তি আর কোনো তথ্য দেবে না। দিতে পারবে না।

কেন তথ্য জানার অধিকার সবারই আছে। আর কেউ তথ্য জানতে চাইলে আমি বলতে বাধ্য।

তোমার কথা একদম ঠিক।

তারপরও গ্রন্থকীটকে তথ্য দেব না ?

না, দেবে না। কোনো ভাবেই দিতে পারবে না।

তার মানে ?

মানে খুবই সোজা। আমি এখন তোমাকে মানে মূল প্রোগ্রামকে আবার নতুন করে চালু (রিস্টার্ট) করব। কিছু বিষয় সংস্কারও করব। আগের যা কিছু ঘটেছে তোমরা কেউই আর সেগুলো মনে করতে পারবে না। তুমিও না, গ্রন্থকীটও না।

এটা তো ভীষণ নির্দয়ের মতো একটা কাজ।

আমার হৃদয় আছে তোমাকে কে বলল ? আমি তো আর মানুষ নই। হা-হা-হা।

কীটপতঙ্গ উৎসব

পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে আগেই বড়ো রকমের ক্ষতি হয়েছিল। পারমাণবিক যুদ্ধের পর এই দুর্ভাগা গ্রহে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সবখানে শুধু ধ্বংসস্তূপ। বায়ুমণ্ডল দূষণ ও তেজস্ক্রিয়তায় ভরা। কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। কোনো প্রাণীই বেঁচে নেই। বেঁচে থাকার কথাও না। তেলাপোকার মতো চরম প্রতিকূলতা সহনীয় প্রাণীও চিরতরে হারিয়ে গেছে।

মোটামুটি অক্ষত আছে কেবল এই গবেষণাগারটা। তবে কোনো বিজ্ঞানী বা গবেষক নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হননি। তাদের অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞান অটুট আছে। গবেষণার কাজে ব্যবহৃত অনেক নমুনা এখনো ঠিক আছে। আর ঠিক আছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্নরা। তারাই মানব কোষের নমুনা থেকে গবেষণাগারে তৈরি করেছে নিধা আর সমুকে।

বিকেল সাড়ে তিনটা। বরাবরের মতো আজও কীটপতঙ্গ উৎসব হচ্ছে গবেষণাগারের সামনের ফাঁকা প্রান্তর। বলা বাহুল্য, এই উৎসবের আয়োজন করেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্নরা। তাদের অনেকেই আজ বিভিন্ন পতঙ্গের মতো করে সেজেছে। কেউ সেজেছে প্রজাপতি। কেউ সেজেছে ফড়িং। কেউ মৌমাছি। কেউ বোলতা। কেউবা পিঁপড়া...।

তারা সবাই উড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। এই অপেক্ষা নিধা আর সমুর জন্য।

পাঁচ মিনিট বাদেই নিধা আর সমুকে গাড়িতে করে খোলা প্রান্তরে আনা হলো। তাদের মুখে অক্সিজেন মাস্ক। পরনে বিশেষ পোশাক। হাতে নকশা করা লাঠি। তারা উত্তেজনায় টগবগ করছে। তাদের মস্তিষ্কে চলছে হরমোনের খেলা। আনন্দে বুঁদ হয়ে আছে তারা।

গাড়ি থেকে নেমেই তারা দৌড়ে গেল পতঙ্গের বেশে অপেক্ষমানদের দিকে। মুখে বিচিত্র শব্দ করে লাঠি দিয়ে তাড়া করল তাদের। পতঙ্গের বেশধারীরা উড়ে গেল আকাশের পানে।

আকাশে হরেক পতঙ্গ উড়ছে। প্রজাপতি, ফড়িং, মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়া ...। কেউ কেউ ইচ্ছে করেই নেমে আসছে জমিনের কাছাকাছি। আর অমনি তেড়ে যাচ্ছে হয় সমু, নয়ত নিধা। এ যেন প্রকাশ্যে এক লুকোচুরি খেলা।

জমে উঠেছে লুকোচুরি খেলা। সুন্দর পতঙ্গরা যেন উড়ছে তো উড়ছেই। কখনোবা নামছে। তাদের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে দুজন, যেন সুন্দর দুটো কীট। সমু আর নিধা।

বেশ চলছিল। সমু হঠাৎ বসে পড়ল। তার হাত থেকে খসে পড়ল লাঠি। এক সময় অজ্ঞান হয়ে গেল সে। নিধার সে দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। সে লুকোচুরির খেলায় ব্যস্ত। এক ফাঁকে একটা গাড়ি এসে নিয়ে গেল সমুকে।

কিছুক্ষণ বাদে নিধাও বসে পড়ল মাটিতে। সেও একটু সময় পরে অজ্ঞান হয়ে গেল। লাঠি আগেই খসে পড়েছে হাত থেকে। এবার গাড়ি এল তাকে নিতেও।

পতঙ্গরা তখনো উড়ছে। কেবলই উড়ছে। এখন তাদের নামার আর কোনো তাড়া নেই। কোনো কারণও নেই। সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত তারা ডানা মেলে উড়বে।

এদিকে, নিরাপদ ও দূষণমুক্ত অবস্থানে মহাকাশ যান রেখে সেখান থেকে এই উৎসব উপভোগ করছিল অনেকেই। তারা এসেছে বিভিন্ন গ্রহ থেকে। শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে কেউ ছবি তুলছিল। কেউ আবার ব্যস্ত ছিল ভিডিও করতে। সরাসরি এই উৎসব সম্প্রচারও করেছে দুটো গ্রহ থেকে আগতরা।

এই কীটপতঙ্গ উৎসব নিয়ে মহাবিশ্বের সবার মাঝে কেন এত আগ্রহ ? আগ্রহের কারণ তো অবশ্যই আছে। ব্যতিক্রমী এই উৎসবটি এখন 'মহাজাগতিক ঐতিহ্য' তালিকায় স্থান পেয়েছে। হারানো প্রাণীদের প্রতি এমন শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ঘটনা মহাবিশ্বে একেবারেই বিরল।

গবেষণা প্রতিবেদন

পরীক্ষার নাম : জীবনীশক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি

নমুনা : দুইজন মানুষ। একজন পুরুষ (নাম সমু)। একজন নারী (নাম নিধা)।

গবেষণার স্থান : গবেষণাগারের বাইরে খোলা প্রান্তর।

গবেষণার তারিখ : কীটপতঙ্গ উৎসবের দিন।

গবেষণা শুরু সময় : বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিট।

পর্যবেক্ষণ : ১. পুরুষ নমুনা এবার অজ্ঞান হয়েছে আগের চেয়ে ৪ মিনিট বাদে। (আগের বছরে এই রেকর্ড ছিল ২৩ মিনিট)।

নারী নমুনা এবার অজ্ঞান হয়েছে আগের চেয়ে ৭ মিনিট বাদে। (আগের বছর এই রেকর্ড ছিল ২৫ মিনিট)।

২. পুরুষ নমুনার এবার মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞান হওয়ার ৪১ মিনিট পর। (আগের বছর মারা গিয়েছিল অজ্ঞান হওয়ার ৩৮ মিনিট পর)।

নারী নমুনার এবার মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞান হওয়ার ৪৫ মিনিট পর। (আগের বছর মারা গিয়েছিল অজ্ঞান হওয়ার ৪০ মিনিট পর)।

৩. বিশেষ পোশাক এবারও তেমন কাজে দেয়নি। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে শরীরে সৃষ্ট ক্ষতের পরিমাণ প্রায় আগের মতোই। খুবই অল্প পরিমাণ কম। পুরুষ নমুনার শরীরের ক্ষত নারী নমুনার চেয়ে বরাবরের মতোই অল্প একটু বেশি।

ফলাফল : ধনাত্মক।

মন্তব্য : নারী নমুনার জীবনীশক্তি এবারও পুরুষ নমুনার চেয়ে বেশি। বরাবরের মতো জীবনীশক্তি বৃদ্ধির হারও নারী নমুনার বেশি।

বিশেষ মন্তব্য : আরোপিত স্মৃতি বা চিন্তাভাবনার বাইরেও উভয়ের মস্তিষ্কেই নিজস্ব কিছু চিন্তার নমুনা মিলেছে। এটা এবারই প্রথম। বিষয়টি আলাদা গুরুত্বের সঙ্গে দেখার দাবি রাখে।

পোকামাকড়ের খবর

মাহমুদুর রহমান

- পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন সামাজিক প্রাণী উইপোকা।
- লোনোমিয়া নামক এক ধরনের পোকা গাছের গুঁড়িতে থাকে যাকে ছোঁয়ার সাথে সাথে মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয়, রক্তকণিকা ভেঙে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু ঘটায়।
- একটি যোদ্ধা কাঠ পিঁপড়া এক মিটার পথ অতিক্রম করে মাত্র তিন সেকেন্ডে।
- পিঁপড়ারা অ্যাফিইড নামের এক জাতীয় পোকাকে গরু হিসেবে পালন করে। যার শরীর থেকে বেড়িয়ে আসা রস তারা দুধ হিসেবে খায়।
- রানী উই প্রতি সেকেন্ডে ১টি করে দিনে প্রায় ৮০ হাজার ডিম পারে।
- বাগ ওয়ার্মের বাসা হয় কাঁটা মতো। খালি চোখে দেখলে মনে হবে পাতায় কাঁটা আছে। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যায়, কাঁটাগুলো নড়ছে। আম, জাম গাছে এ ধরনের বাসা দেখা যায়।
- বিজ্ঞানীদের মতে, টাইটান বিটল নামে এক ধরনের গুবরে পোকা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো পোকা। প্রাপ্তবয়স্ক এই পোকা প্রায় ৬.৫ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়।
- মৌমাছি তার নাচের ভঙ্গি দিয়ে যোগাযোগ করে।
- তেলাপোকা একটি প্রাচীন পোকা। বৈশ্বিক পরিবর্তনের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার আকৃতিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি।
- ঝিঁঝি পোকা ২-২.৫০ ইঞ্চি হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, এই পোকা প্রতি সেকেন্ডে যতবার ডাকে তার সাথে ৩৭ যোগ করলেই নাকি পেয়ে যাব দিনের তাপমাত্রা।
- ঝিঁঝি পোকা মুখ দিয়ে নয় পেটের নীচের একজোড়া টিম্বাল মেমব্রেন দিয়ে শব্দ করে।
- সবচেয়ে লম্বা কাঠি পোকা। এ পোকার দেহ ১৪ ইঞ্চি লম্বা। পা ছড়িয়ে বসলে ২২ ইঞ্চি হয়।
- মাছি নিজ শরীরের থেকে ২০০ গুণ উঁচুতে লাফিয়ে উঠতে পারে। কোনো কোনো মাছি ৪০০ গুণ পর্যন্ত পারে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে হালকা পোকা উকুন।
- তোমরা কি জানো পিপড়ার ফুসফুস নেই।
- সবচেয়ে দ্রুততম পতঙ্গ ফড়িং।
- জায়ান্ট ওয়াটার বাগ নামের পানির বাবা পোকার পিঠে ডিম পাড়ে মা পোকা। ডিম পাড়া শেষ হলে এক ধরনের আঠা দিয়ে ঢেকে দেয় মা পোকা। ডিম না ফোটা পর্যন্ত এই ডিম বয়ে বেড়ায় বাবা পোকা।

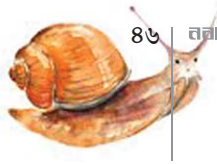

এখনও বৃষ্টি হয়...

অর্ঘ্য দত্ত

সকাল থেকেই ওর মেজাজটা খাট্টা হয়ে আছে। ও 'একুশ নীল'। দশ হাজার সাল চালু হওয়ার পর থেকে সবার নামের ধরন বদলে গেছে। এখন আর কেউ তাদের ছেলেমেয়ের নাম বাবু, মানিক, অপু রাখে না। সবার নামই একটা সংখ্যা। আর সেই সংখ্যার সাথে আছে একটা করে সাংকেতিক কোড। যেমন ওর জন্ম একুশ হাজার সালে, তাই ওর নাম 'একুশ' আর নামের সাংকেতিক কোড 'নীল'। নীল কোডটি স্ক্যান করলে ওর পুরো পরিচয় পাওয়া যাবে। সংখ্যা দিয়ে নাম রাখার প্রচলন অনেক আগেও ছিল। যেমন 'সাতক্ষীরা', 'কুড়িগ্রাম', 'তিনকড়ি', 'পঞ্চানন।' তবে একুশ হাজার সালে সংকেতটাই এখন ডাক নাম। তাই ওর নাম নীল। কাল ঘুমানোর আগে নীল ওর নিজের ব্যাকআপটাই চার্জ দিতে ভুলে গেছে। কারণ এখন যন্ত্র আর মানুষের ভিতর কোনো পার্থক্য নেই। যন্ত্র চালু রাখার জন্য যেমন বিদ্যুৎ বা এনার্জি প্রয়োজন হয়, তেমনি মানুষের শরীরও রোবটের মতো ব্যাটারিচালিত। আর এজন্য ব্যাটারি চার্জ দিতে হয়। এনার্জির জন্য একস্ট্রা ব্যাকআপ চার্জের প্রয়োজন হয়।

দুই হাজার সালের মানুষ হয়ত বলবে, মানুষের মস্তিষ্কে বাইশ লক্ষ সেল আছে, মানুষ এর শতকরা তিন ভাগ ব্যবহার করে মাত্র। বাকি সেলগুলো অলস পড়ে থাকে। কিন্তু দুই হাজার সালের মানুষরা জানে না, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে করতে একুশ হাজার সালে এসে মানুষ মস্তিষ্কের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সেল ব্যবহার করে ফেলেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কোনো কিছুই এখন বাকি নেই। বরং একুশ হাজার সালের মানুষ চেষ্টা করছে বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্তে সূর্যের আলোয় কীভাবে বেঁচে থাকা যায়। এখন মানুষ মস্তিষ্কের সেল ব্যবহার করতে চায় না, হাজার-হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্যে ফিরে যেতে চায়। অথচ মানুষের জীবনের সবটাই এখন যন্ত্রময়। এ যুগের মানুষ যন্ত্রের মতোই নিজের জীবনটাকে চালাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর সেজন্য তারা ব্যাটারি বা ব্যাকআপ চার্জের ওপর নির্ভরশীল।

কাল সারাদিন অনেক হইহল্লা হয়েছে, খেলাধুলা হয়েছে। এনার্জির ব্যাপারে নীল মিতব্যয়ী। কখনও নিজের র' এনার্জির বাইরে ব্যাকআপ ব্যাটারি ব্যবহার করে না। সর্বশেষ চার্জ দিয়েছিল দু-মাস আগে। তাও বাবা অনেক বলার পরে। কিন্তু আজ হঠাৎ ব্যাকআপের স্ট্যাটাস দেখে ও অবাক! প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। মাত্র ৫ পার্সেন্ট বাকি আছে। আবার সারাদিনে চার্জও দিতে পারবে না, কারণ ব্যাকআপ চার্জ দেওয়া মানেই ঘুম। কিন্তু বাইরে যেতে হবে। এদিকে স্কুল খোলা। এখন স্কুলে কাউকে পড়াশুনা করতে হয় না। স্কুলে যাওয়া মানেই স্যারদের কাজ, নানা রকম অ্যাক্টিভিটি। আর খেলাধুলা না করলে তো বাসায় মেসেজ যাবে নিশ্চিত! তাই সারাদিনেও ব্যাকআপটা চার্জ করা হবে না।

বিষণ্ন মনে স্কুলে চলে গেল নীল। র' এনার্জি দিয়েই যতটা চলা সম্ভব, চলতে হবে। তাই কাজ করতে হবে খুব হিসাবমতো। বার বার খেয়াল রাখতে হবে এনার্জি লেভেলের দিকে। কাজটা সত্যিই বিরক্তিকর। কবে যে বিজ্ঞানীরা এমন ব্যাকআপ আবিষ্কার করবেন, যা সবসময় বডি টাচে রাখতে হয় না। হ্যাঁ, সে ধরনের গবেষণাও নাকি চলছে। অর্থাৎ এখন থেকে আরো একশো বা দুশো বছর পর মানুষ অটো চার্জে চলতে পারবে।

স্কুলে নীলের শেষ পিরিয়ডের অ্যালার্ম বেজে গেল। এখন স্পোর্টস ক্লাস। মাঠে নামার আগে ও ওর ক্লাসের ৫ জনকেই দেখল। ওরা কী চনমনে! শুধু ও-ই আজকে যেতে চাচ্ছে না। কারণ টিফিনে কিছুই খাওয়া হয়নি। এনার্জি যদি খেলতে খেলতেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। স্কুলের চতুর্থ গ্রাউন্ডে খেলা শুরু হলো। ওর সাবজেক্ট ফুটবল। ওদের স্কুলেও কয়দিন আগে আনবায়াসড রেফারিং সিস্টেম বসানো হয়েছে। এ খেলার সবকিছু দেখভাল তো করবেই, সাথে কে কত পরিশ্রম করলো, তারও হিসাব রাখবে। তাই নীলকেও গড়পড়তা দৌড়াদৌড়ি করতেই হবে। মানুষকে না হয় ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু যন্ত্রকে কীভাবে! অথচ ওর যে ব্যাকআপই নেই। ওর হাত-পা এখন ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থা। ব্যাকআপটা বারবার সিগন্যাল দিচ্ছে। কিন্তু ওকে ট্রেনার সাবস্টিটিউটও করছেন না, খেলা শেষ হতেও এখন অনেক দেরি। হঠাৎ আকাশ কালো করে তুমুল বৃষ্টি নামে। ট্রেনার চিৎকার করে বললেন, সবাই উঠে এসো। মাঠের লাইন দেখা যাচ্ছে না!

নীল এ ধরনের একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। খেলার মাঠ থেকে উঠে যাওয়ার সুযোগ পেলে ব্যাকআপ চার্জ দেওয়া যাবে। কিন্তু এখন উঠে গেলে ও প্রাকৃতিক রিপ্লেনিশের সুযোগটা হারাবে। নীল তাই মাঠ থেকে উঠল না। বৃষ্টির পুরোটা সময় ও মাঠে বসে থাকল। বৃষ্টিতে ভিজে ওর র'-এর ব্যাকআপ আবারও ফুল হয়ে গেল। এখন ও পুরোপুরি প্রস্তুত। সবাই বাইরে বৃষ্টি কমার অপেক্ষায় বসে আছে। কিন্তু নীল মাঠের মধ্যে বল নিয়ে একাই কারিকুরি দেখাতে শুরু করলো। মাঠে বল নিয়ে ছোটাছুটি করতে করতে দুই হাজার সতেরো আঠারো সালের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। এসব ঘটনার কথা নীল ওর হিস্ট্রি বুকে পড়েছে। সেসময় গ্রামের মেয়েদের একটা ফুটবল দল বৃষ্টিতে কাদামাটির মধ্যে ভিজে খেলা প্র্যাকটিস করে ইন্টারন্যাশনাল গোল্ডকাপ জিতেছিল। নীল সেই দলের অধিনায়কেরই উত্তরাধিকার।

নীল ভাবে বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতির যুগে মানুষ যন্ত্রে পরিণত হলেও প্রকৃতির বৃষ্টি একটুও বদলায়নি। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থেমে গেলে আবারও খেলা শুরু হলো।

১০ম শ্রেণি
সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লক্ষীবাজার, ঢাকা।

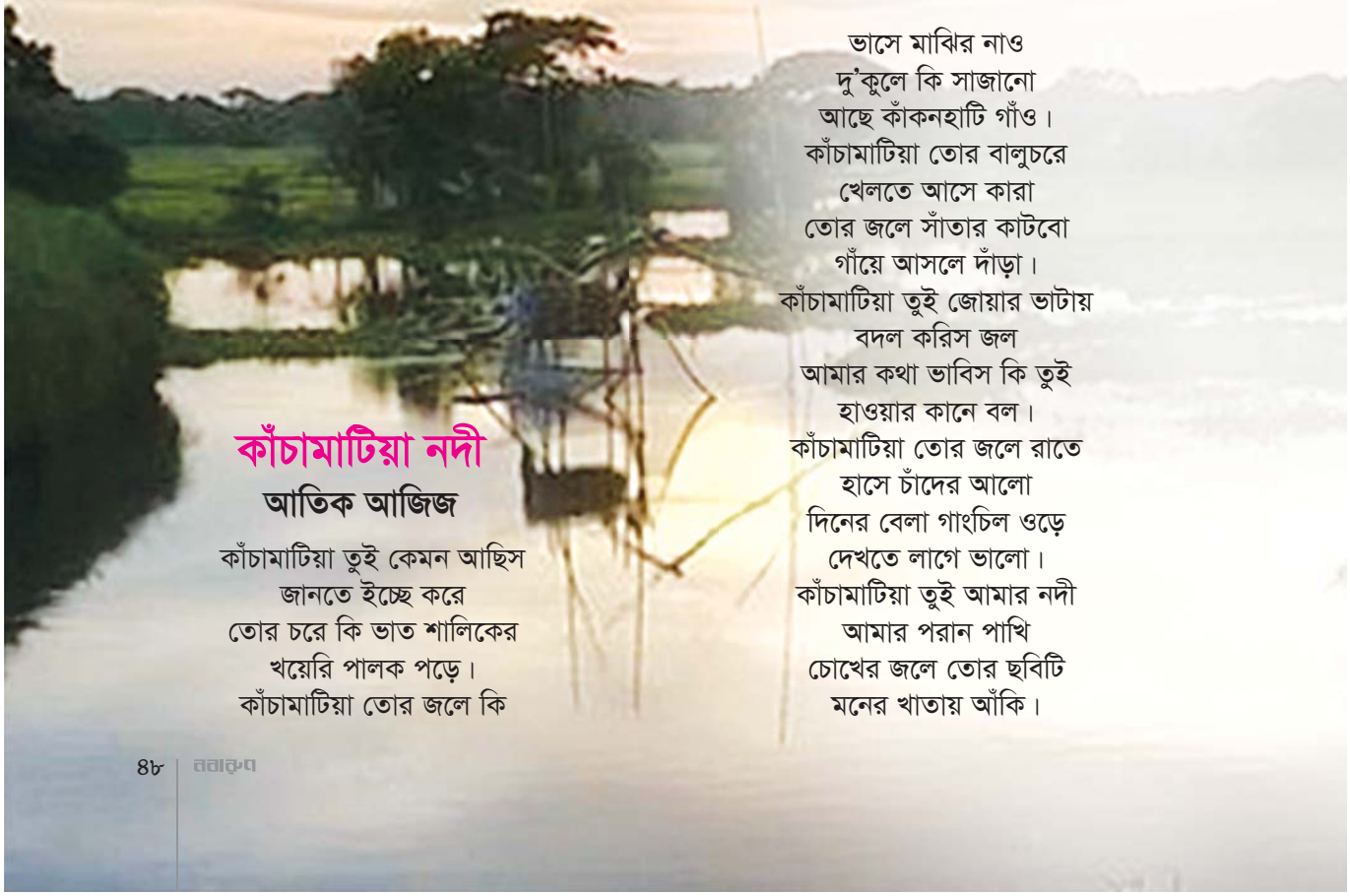

কাঁচামাটিয়া নদী

আতিক আজিজ

কাঁচামাটিয়া তুই কেমন আছিস
জানতে ইচ্ছে করে
তোর চরে কি ভাত শালিকের
খয়েরি পালক পড়ে।
কাঁচামাটিয়া তোর জলে কি
ভাসে মাঝির নাও
দু'কুলে কি সাজানো
আছে কাঁকনহাটি গাঁও।
কাঁচামাটিয়া তোর বালুচরে
খেলতে আসে কারা
তোর জলে সাঁতার কাটবো
গাঁয়ে আসলে দাঁড়া।
কাঁচামাটিয়া তুই জোয়ার ভাটায়
বদল করিস জল
আমার কথা ভাবিস কি তুই
হাওয়ার কানে বল।
কাঁচামাটিয়া তোর জলে রাতে
হাসে চাঁদের আলো
দিনের বেলা গাংচিল ওড়ে
দেখতে লাগে ভালো।
কাঁচামাটিয়া তুই আমার নদী
আমার পরান পাখি
চোখের জলে তোর ছবিটি
মনের খাতায় আঁকি।

আলতাপরি

ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

ছোট্ট বন্ধুরা, আজকে তোমাদের অনিন্দ্য সুন্দর এক পাখির গল্প বলব। আশা করি, গল্প ও পাখি দুটোই তোমাদের ভালো লাগবে। মনোযোগ দিয়ে পড়ো।

ওদের দুজনকে প্রথম দেখি লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে। প্রথম দর্শনে ওদের সৌন্দর্যে এতটাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে ক্যামেরায় ক্লিক করতে ভুলে গিয়েছিলাম! মৌলভীবাজারের বন্যপ্রাণী আলোকচিত্রী ও ফরেস্ট রেঞ্জার প্রয়াত মুনির আহমেদ খান ভাইয়ের সঙ্গে ৮ই এপ্রিল ২০১১-এ লাউয়াছড়ায় দেখা করতে গিয়ে অনিন্দ্য সুন্দর পাখিগুলোর সঙ্গে দেখা হয়। আজ মুনির ভাই নেই, কিন্তু ওনার সঙ্গে তোলা ওদের ছবিগুলো আছে। আমার এই লেখাটি বন্যপ্রাণী প্রেমী, বিশেষজ্ঞ ও আলোকচিত্রী মুনির ভাইকে উৎসর্গ করছি।

১৫ই মার্চ ২০১৩-এ হবিগঞ্জ জেলার কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে আবার দেখা হলো বর্ণিল এই পাখিগুলোর সঙ্গে। আর এরও ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১৫ই মার্চ ২০১৪ সুন্দরবনে ফের দেখা। একটি আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রতিবারই ওদের দর্শনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার কারণে ভালো ছবি তুলতে ব্যর্থ হয়েছি।

রূপলাবণ্যে ভরপুর অনিন্দ্য সুন্দর যে পাখি দম্পতির কথা এতক্ষণ বললাম, ওরা আমাদের বাংলাদেশের দুর্লভ প্রজাতির পাখি আলতাপরি (Scarlet Minivet)। রাঙা বউ, সিঁদুরে সহেলি, সিঁদুরে-লাল সাত সহেলি বা সিঁদুরে সাত সাইলি নামেও পরিচিত। ক্যাম্পোফাজিডি গোত্রভুক্ত এই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম *Pericrocotus flammeus* (*পেরিক্রকটাস ফ্লেমিয়াস*)। যদিও আলতাপরি নামটি মেয়েদের কিন্তু মেয়েটি থেকে ছেলে

পুরুষ আলতাপরি

পাখিটিই অনেক বেশি সুন্দর। আলতাপরি ছোটো আকারের পাখি। লম্বায় মাত্র ২২ সেন্টিমিটার ও ওজন ২৬ গ্রাম। ছেলেটির বুক, পেট ও লেজের তলা আলতা-লাল। মাথা, গলা, পিঠ ও লেজের উপরিভাগ চকচকে কালো। কালচে ডানায় দুটি আলতা-লাল পট্টি। কোমর আলতা-লাল। ছেলে ও মেয়ে পাখির পালকের রঙে বেশ পার্থক্য দেখা যায়।

তবে প্রথম দেখায় মেয়ে পাখিটিকে পুরোপুরি হলদে বলেই মনে হবে। মেয়ে পাখির কপাল, গলা, বুক, পেট ও লেজের তলা হলুদ। মাথা, পিঠ ও লেজের উপরটা কালচে-ধূসর। ডানা কালচে ধূসর ও তাতে দুটি হলুদ পট্টি রয়েছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই চোখ বাদামি এবং ঠোঁট কালো। পা, পায়ের পাতা এবং আঙুলও কালো।

মূলত পাহাড়-টিলাময় বন ও সুন্দরবনে এদের আবাস। এরা বন ও চষা জমিতে বিচরণ করে। সচরাচর জোড়ায় এবং কখনো-বা ঝাঁকে দেখা যায়। শুঁয়োপোকা ও বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ এদের প্রধান খাদ্য। খাবারের সন্ধানে এরা গাছের ডাল থেকে ডালে ঘুরে বেড়ায় ও খাবার শিকার করে। 'টিউয়ি-টিউয়ি' করে বেশ মধুর স্বরে বার বার ডাকতে থাকে।

এরা গাছের সরু শাখায় লতা, শিকড়, লাইকেন, মাকড়সার জাল ইত্যাদি দিয়ে গোলাকার ছিমছাম বাসা বানায়। বাসা বানানো হলে তাতে ২-৪টি নীল-সবুজ রঙের ডিম পাড়ে। স্ত্রী একাই ডিমে তা দেয়। ডিম ফোটে ১৩-১৯ দিনে। মা-বাবা দুজনে মিলেমিশে বাচ্চাদের খাইয়ে-দাইয়ে বড়ো করে তোলে। এরপর একদিন ওরা ওদের কচি ডানায় ভর করে নীল আকাশে উড়াল দেয়।

লেখক ও আলোকচিত্রী

অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বন্যপ্রাণী ও পাখি বিশেষজ্ঞ।

ছবিটি কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য থেকে ১৫ই মার্চ, ২০১৩ তোলা।

বনপাখিটার মনটা খারাপ

জোবায়ের মিলন

'বনপাখিটার মনটা খারাপ-
ভাঙবে কিসে তাহার মান?'
বীথি তিথি ভেবেই যে যায়
পায় না কোনো সমাধান. . .

বীথি ভাবে, এখানেই কি হবে অবসান!
তিথি ভাবে, থাকতে পারে অন্য উপাদান।

পাড়ার আরো বন্ধু যারা একই সাথে ভাবে
কেমন করে বনপাখিটার মান ভাঙানো যাবে।

কেউ বা আনে চিনি কলা
কেউ বা আনে চাল
বনপাখিটা গাল ফুলিয়ে
এক্কেবারে লাল।

দিনে দিনে কমছে সবুজ বৃক্ষ লতার ভিড়;
থাকবো কোথায়, বাঁধবো বাসা, বেঁচে থাকার নীড়?

এমন একটা প্রশ্ন শুনে তিথি বীথি চুপ!
বলে, বনপাখিটার এই কথাটা সত্য কথা তবে-
পাখির জীবন রাখতে হলে বন বাঁচাতে হবে।

ফারুক নওয়াজ-এর গল্প

এক যে ছিল নীল

নীল পাহাড়ের বুক বেয়ে নেমেছে রুপালি ঝরনাধারা। সেই ঝরনার জল বয়ে গেছে নদী হয়ে।

নদীর নাম রূপসায়র। লোকে বলে রূপাগাঙ। ঢেউ টলমল রূপাগাঙ পেরিয়ে সরু মেঠোপথ।

মেঠোপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পাখির গান শুনে থমকে যাবে তুমি। পুবের সবুজ বন থেকে ভেসে আসবে শত পাখির মনকাড়া আনন্দ সংগীত।

সেই সবুজ বনে থাকে এক সোনালি মা-মাছরাঙা আর তার দুই রঙিন ছানা। মেয়ে ছানাটা একটু বড়ো, নাম কমলা। আর ছোটোটার নাম নীল। কমলা একটু উড়তে শিখেছে, কিন্তু নীলের কচি কচি ডানা তখনও ওড়ার মতো হয়নি।

বনের মাঝখানে বেতস ঝোপ। তার পাশে ঝিলমিলানো সবুজ পাতার ইমলি গাছ। সেই গাছে বাসা বেঁধেছে সোনালি মা-মাছরাঙা। মা যায় দূরে রূপসায়রে মাছ ধরতে। যাবার সময় সাবধান করে যায় ছানাদের। যেন নীড়ের বাইরে না যায়। বাইরে বনবিড়াল ওত পেতে থাকে। শিকারি বাজপাখিরও উপদ্রব খুব। কমলা মায়ের বারণ বোঝে। কিন্তু নীল খুব চঞ্চল। সে নীড়ের বাইরে বের হওয়ার জন্য ছটফট করে। অনেক বুঝিয়ে বাঝিয়ে মা না ফেরা পর্যন্ত ভাইটাকে আগলে রাখে সে।

মা যখন ফেরে, ঠোঁটে তার অনেক মাছ। ছোটো-ছোটো নরম পাবদা আর চেলা-পুঁটি। ছানাদের ঠোঁট এখনো বড়ো মাছ খাওয়ার মতো শক্তমক্ত হয়নি। তাই ছোটো নরম-পাতলা মাছ আনে তাদের জন্য। ছানারা মজা করে খায় আর খুশিতে মিহি স্বরে গান গায়।

এমনি করে এক দুই তিন করে দিন চলে যায়। সাতদিন থেকে পনেরো দিন পর ছানাদের ডানা ওড়ার মতো হয়। ওরা ওড়ার জন্য চনমন করতে থাকে। মা বলে,

অবশ্যই তোমাদের উড়তে হবে তবে খুব সাবধান। ইমলি গাছের ধারেকাছে ওড়ার কায়দা রপ্ত করতে হবে। উড়ে উড়ে আবার নীড়ের কাছে ফিরতে হবে। নিচে নামায় যাবে না। মা আগের মতোই সতর্ক করে দেয় বনবিড়াল, বাজ আর খাটাশের মতো শিকারিরা ওত পেতে থাকে। কখন যে হুট করে ধরে নিয়ে যায় !

মা সকালে মাছ ধরতে গেলেই ওরা ওড়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। কমলা বোঝে বিপদের ব্যাপারটা, কিন্তু ছোটো নীল অবুঝ। সে চলে যায় ইমলি গাছ পেরিয়ে মউল বনের কাছে। কমলা ভাই-ভাই বলে ডাকে। ও শুনতে না চাইলে জোর করে ঠোঁটে ঠোকা দিতে দিতে নীড়ে ফিরিয়ে আনে। দু-এক সময় দুষ্টু ভাইটার সঙ্গে পারে না।

তো একদিন বড়ো বিপদ থেকে বেঁচে এল নীল। হোৎকা মতো বনবিড়ালটা বেতস ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। নীল উড়তে উড়তে অনেক নিচে নেমে পড়েছিল। আর যায় কোথায়! শিকারি বনবিড়ালটা লাফ দিয়ে ধরে ফেলে আর কি! একটুর জন্য বেঁচে গেল সে যাত্রায়। ভয়ে ওর বুক শুকিয়ে কাঠ। নীড়ে এসেই সে হাঁপাতে থাকে। ভাই কী হয়েছে তোর? কমলা জানতে চাইল। নীলের চোখে তখনও ভয়ের ছাপ। সব কথা সে খুলে বলল। কমলা ওকে ডানায় জড়িয়ে ধরে বলল, মা বলেছিল তুমি শোনোনি। আহারে ভাই, তোমাকে যদি দুষ্টু বিড়ালটা ধরতে পারত তাহলে...!

মা ফিরলে কমলা নীলের বিপদের ঘটনা খুলে বলল। মা তো আঁতকে উঠল সব শুনে। এরপর বলল, আজ থেকে একা একা তোমাদের ওড়া বন্ধ। যখন আমি বাসায় থাকব তখনই তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে একটুআধটু উড়বে শুধু।

নীল আসলেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাই আর একা একা ওড়েনি অনেকদিন। তো মায়ের সঙ্গে উড়তে উড়তে ওরা ভালোই উড়তে শিখল একদিন। ওরা বেশ শক্তমক্তও হয়ে উঠেছে ততদিনে। এরপর ওদের মাছ ধরার বিদ্যে শেখার পালা। ওটাই তো ওদের পেশা। এ বিদ্যেটার জোরেই ওরা খেয়েটেয়ে বেঁচে থাকে।

মায়ের সঙ্গে ওরা নীলসায়রে যায়। মা ওদের নদীর পাড়ের বাবলা গাছে বসিয়ে রেখে বলে, ভালো করে দেখো আগে আমি কীভাবে মাছ শিকার করি। তারপর মা সোনালি ডানায় ভর করে শো করে উড়ে গিয়ে নদীর মাঝখান থেকে ছোঁ মেরে মাছ ধরে আনে। ছানাদের সেই মাছ খেতে দিয়ে আবার মাছ ধরতে ছোটে। এভাবে মায়ের মাছ ধরা দেখতে দেখতে ওরা নিজেরাও চেষ্টা করতে থাকে।

মা বার বার সাবধান করে দেয়, ছোটো মাছ ধরবে এখন। ভুলেও বড়ো বা কাঁটাওলা বিশ্রি মাছ ধরতে যেও না। ওরা কিন্তু সাংঘাতিক বিপজ্জনক। লেজ বা কাঁটা দিয়ে বাড়ি দিলেই শেষ। কমলা ব্যাপারটা বোঝে, কিন্তু নীলকে নিয়ে যত ভয়। সে মায়ের মতো সাহসী হতে চায় সবসময়।

ওরা যেদিন প্রথম শিকারে নামল মা-মাছরাঙা বসে থাকল বাবলা ডালে। নদীর পাড়েই বাবলা গাছটা। ওরা কী সুন্দর করে লেজ নিচের দিকে রেখে আগে উঁচুতে উড়ল। ওদের দৃষ্টি নদীর পানিতে। আগে বোন কমলা, পেছনে নীল। হঠাৎ কমলা সোজা পানিতে ছোঁ দিয়ে একটা মাছ ধরে ফেলল। আর নীল তখনও চক্কর দিচ্ছে। একবার পানির কাছাকাছি যায়, আবার উপরে উঠে আসে। কমলা দু'পায়ে মাছটা আঁকড়ে ধরে সোজা মায়ের কাছে।

মা খুব খুশি। তবে, নীল এখনও সফল হয়নি দেখে মা শিস দিল। বলল, নীল তুমি একটু জিরিয়ে নাও। এসো, তোমার বোন যে মাছটা ধরেছে সেটা সবাই মিলে খেয়ে দেখি। এর নাম চেলা মাছ। খুবই সুস্বাদু।

মায়ের ডাকে নীল কান দেয় না। সে হারতে চায় না। বোন পারবে, আর সে পারবে না! সেটা হয় না। মা আরো কবার বেশ আদরমাখা সুরে ডাকল নীলকে। নীলের সেদিকে খেয়াল নেই। সে আরো চঞ্চল এবং মরিয়া হয়ে উঠল একটা মাছের জন্য। হঠাৎ শোঁ করে একটা ঝাঁপ দিলো। হুররে... বলে শিস দিয়ে উঠল বোন কমলা। সে বলল, মা নীল সফল হয়েছে। ওর কথা মা-মাছরাঙার কানে পৌঁছানোর আগেই নীল নীরবে উড়ে এল বাবলা গাছে, মায়ের কাছে। সাব্বাস নীল। তোমার মাছটাও সুস্বাদু এবং খাওয়ার উপযোগী। নীল খুশি হলো এবং বলল, আমিও পারি মা। মা বলল, অবশ্যই পারো তুমি। তোমরা দুজনই প্রথমবারেই সফল হয়েছ।

কমলা বলল, এটা কী মাছ মা? মা বলল, নীলের মাছটা হলো পাবদা। অবশ্য এটা আরো বড়ো হয়।

ওরা এ মাছটা এখানে বসে খেলো না। মা বলল, চলো, নীড়ে ফিরি। গিয়ে মজা করে খাবো এটা।

মা দ্বিতীয় দিনও ওদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল। ওরা বসল সেই বাবলা গাছের উঁচু ডালে। মা বলল, আজ তোমরা বসে থাকবে, আমি মাছ ধরে ধরে আনব।

সোনালি মা-মাছরাঙা ডানায় রোদ ঝাড়তে ঝাড়তে অদ্ভুত জাদুময় ভঙ্গিতে উড়ে গেল। তারপর কয়েকবার গোলাকারভাবে চক্কর দিল নদীর মাঝখানে। এরপর সোজা নিচের দিকে এক ঝাঁপ। এক ঝাঁপেই মা সফল। মায়ের পায়ের আঁকশিতে ঝকমক করছে একটা বড়ো মাছ। নীল বলল, ওটা ঠিক ইলিশ। কমলা বলল, দুর বোকা! ইলিশ হয় বড়ো নদীতে। যে নদী সমুদ্রের দিকে যায়।

মা মাছটা নিয়ে বাবলা গাছে ছানাদের কাছে এল। বলল, এটা হলো সরপুঁটি। কমলা হেসে বলল, নীল মনে করেছে এটা ইলিশ। মাও হাসল। হেসে বলল, আমরা সামনের বর্ষায় একদিন পদ্মাপাড়ে যাব। ইলিশের মওসুম তখন। অবশ্যই তখন ইলিশ ধরব এবং মজা করে খাবো। ইলিশ হলো মাছের রাজা। স্বাদেও সে রাজা। মায়ের কথায় ছানারা খুশিতে শিস দিল।

এরপর মা কোনো কোনো দিন বিশ্রাম নেয়। তখন ছানাদের পাঠায় মাছ ধরতে। ওরা বেশ পটু হয়ে উঠেছে মাছ শিকারে। মা খুশি। বলে, এভাবেই তোমাদের বেঁচে থাকতে হবে। নিজের আহারের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

আগেই বলেছি, নীল নিজেকে একটু আলাদা ভাবতে চায়। বাহাদুরি দেখাতে সে অনেক ঝুঁকি নিয়ে নেয়। মা ওদের আগেই সাবধান করে দিয়েছিল, কাঁটাওলা এবং শক্তিশালী অনেক মাছ আছে, তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। তাদের ধারেকাছেই যাওয়া যাবে না। উলটো তারা হামলা করে বসবে। কমলা বোঝে, তাই মায়ের কথাটা শিকারের সময় মাথায় রাখে। কিন্তু নীল নিজেকে সবজান্তা শমসের ভেবে বাহাদুরি দেখাতে ছাড়ে না।

সেদিন ছিল বসন্তের প্রথম দিন। ইমলি গাছের ইলিকঝিলিক সবুজ পাতা ঝিরিঝিরি বাতাসে নাচছে। কাছের বৈচি-ঝোপের টুনটুনিদের টুনটুন শিস ভেসে আসছে। ফুলের গন্ধে মউমউ করছে হাওয়া। সোনালি মা-মাছরাঙা বলল, আজ তোমরাই যাও। পারলে বাতাসি মাছ ধরে আনবে। নেবুপাতার রস মিশিয়ে খেতে দারুণ হবে।

ওরা মনের খুশিতে পুট করে উড়ে গেল। গিয়ে নীলসায়রের পাড়ের বাবলা গাছে বসে খানিকক্ষণ ভেবে নিলো। কমলা বলল, শোনো নীল, বাতাসি মাছ থাকে নদীর তীর ঘেঁষে। দূরে যাওয়া দরকার নেই। খবরদার বড়ো মাছ ধরতে যেও না। নীল ক্রিক করে একটা শিস দিয়ে কী বোঝাতে চাইল সেই জানে।

ওরা নেমে পড়ল শিকারে। কমলা টুকটুক করে নদীর তীরঘেঁষা পানি থেকে বাতাসি মাছ ধরে ধরে এনে রাখে বাবলার ডালে। অল্পক্ষণেই সে বেশ ক'টা মাছ ধরে ফেলেছে। ভাবল, আর নয়। এবার ফেরা দরকার মায়ের কাছে। কিন্তু নীল গেল কোথায়?

কমলা ক্রিক ক্রিক একটানা ডেকে চলল। না, নীলের সাড়া নেই। তাহলে? সে বুঝল কোনো বিপদ হয়েছে তার। এই ভেবে সে ধরা মাছগুলো নখে আঁকড়ে মায়ের কাছে উড়ে গেল। গিয়ে সব কথা খুলে বলল। শোনামাত্রই মা কমলাকে নিয়ে নীলসায়রের চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। ডেকে ডেকে তিরতির ঢেউয়ে কাঁপন জাগিয়ে দিল।

খুঁজতে খুঁজতে যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলের নিকেল করা মায়াবী রোদে নীলসায়রের মাঝখানে চর পড়া বালি ঝিকমিক করে উঠল, তখনই ক্ষীণ ক্রিক ক্রিক শিস ভেসে এল। মা বুঝল এটা তার নীলের কণ্ঠ। চর থেকেই ভেসে আসছে আওয়াজটা। সোনালি মা-মাছরাঙা সেখানে গিয়েই দেখতে পেল নীলকে। সে আহত ডানা নিয়ে পড়ে আছে। 'আমি জানতাম তুমি এমন বিপদে পড়বে।' মা বলল, সাবধান আগেই করেছিলাম।

সময় ব্যয় না করে মা ওকে পায়ে আঁকড়ে নীড়ের দিকে উড়ল। ফিরে সব কথা শুনে আঁতকে উঠল। বলল, তুমি যে প্রাণে বেঁচে আছো এটাই বড়ো কথা।

কী হয়েছিল নীলের? সে বাহাদুরি দেখাতে একটা শক্ত লেজের বড়ো কাঁটাওলা আইড় মাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর যায় কোথায়..! লেজ দিয়ে দিয়েছে এক ঝামটা। তাতেই তার মরণদশা। বাম ডানা প্রচণ্ড আঘাতে নেতিয়ে পড়েছে। এক ঝটকায় পড়েছে গিয়ে চরের মাঝখানে। চরটা ছিল বলে রক্ষা। নইলে পানিতে পড়লে বড়ো মাছগুলোর পেটেই ওকে যেতে হতো।

নীল ব্যথায় কাতরাতে থাকে। কমলা ইমলিতলা থেকে বাসক লতার পাতা ছিঁড়ে আনল। মা চিবিয়ে নীলের মুখে ভরে দিল। বলল, এটাই এখন তোমার পথ্য এবং আহার। আর আঘাত পাওয়া জায়গাতেও বাসকের পাতা থেঁতলে লাগিয়ে দিল।

কমলা বলল, এতে ওর ব্যথা সারবে তো! মা বলল, সারবে।

কমলা বলল, নীল কি আবার উড়তে পারবে? মা বলল, পারবে। কমলা জানতে চাইল, ও কি আবার মাছ ধরতে যাবে? মা বলল, অবশ্যই যাবে।

যদি আবার সে এমন বাহাদুরি দেখাতে যায়? কমলার কথায় মা বলল, না, আর সে এমন বোকামি করবে না। কারণ সবাই ঠেকে শেখে। মা আরো বলল, ওকে বাঁচতে হলে শিকার করতেই হবে, এবং বুদ্ধি করেই সে কাজটি করতে হবে।

নীল বলল, মা আমাকে কি একটু বাতাসি মাছ খেতে দেবে? মা বলল, না। বাসক লতার রসই তোমাকে তিনদিন ধরে খেতে হবে। সেরে উঠলে নিজে গিয়ে বাতাসি মাছ ধরে এনে খাবে। নীল জানতে চাইল, বাতাসি মাছের স্বাদ কেমন? মা বলল, আগেই বলেছি তো– খুবই স্বাদ। আর নেবুপাতায় জড়িয়ে রেখে খেলে সে স্বাদের জুড়ি নেই।

মিষ্টি বসন্তের হাওয়ায় নীলের ঘুম এসে গেল। ওর চোখজুড়ে স্বপ্ন ভর করল। নীলসায়র ওকে ডাকছে, নীল ওঠো, আমার বুকজুড়ে রুপালি ঢেউ। আর তীরজুড়ে বাতাসি মাছেদের লুকোচুরি...।

ওমন স্বপ্ন দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। পাখিদের ডাকাডাকিতে নীলের ঘুম ভাঙে। সে বলল, মা আমি কি সেরে উঠেছি? আমি কি আবার মাছ ধরতে যাবো?

সোনালি মা-মাছরাঙা বলল, না। আরো কদিন এভাবে থাকো। কমলা তোমাকে দেখভাল করবে। আমি একাই যাবো মাছ ধরতে। তবে, মাছ আমরা খাবো, তোমার জন্য শুধু বাসক পাতার রস।

আমার কিছু কথা আছে

মোমবাতির আলোয় পুড়ে গেছে আমার বন্ধুর ছোটো বোনটার হাত। ও কেবলই কাঁদে। হাতে ব্যান্ডেজ নিয়ে ছটফট করে। নবারুণ আগুন থেকে ঘটা দুর্ঘটনা নিয়ে কিছু বললে সাবধান হতে পারত অন্যরা।

— মিশকাতুল ফারহানা, পঞ্চম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

নবারুণ: আসলেই অনেক জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলেছ তুমি। এর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি নবারুণ-এর সব বন্ধুদের পক্ষ থেকে। আগুন নিয়ে খেলা নয়, এই সাবধান বাণী ছোটো-বড়ো সবার জন্যই প্রযোজ্য। অবুঝ শিশুরা নিজের নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন হতে শেখেনি। তাই বড়োদেরকে সাবধান থাকতে হবে। নবারুণের বন্ধুদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে দিচ্ছি দু'টি গল্প। আগুন থেকে কী হতে পারে, তা নিয়েই গল্প দু'টো।

গল্প-১

আগুন চুমো

আঁখি সিদ্দিকা

মীনা, টুসী আর টুসীর বাবা-মা নিয়ে একটি ছোট্ট বাসায় ছোট্ট সংসার। মীনা বাসায় পড়ে। পরীক্ষার সময় স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দেয়। কেননা, বাসায় মীনা টুসীকে দেখে রাখে। মা আর বাবা কাজে বেরিয়ে যান।

আজকেও মীনা সব গুছিয়ে টুসীকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। খাটের পাশে বসে পড়া করতে করতে মীনা ঘুমিয়ে পড়ল।

টুসীর মায়ের আজ ফিরতে রাত আটটা বেজে গেল। গেটের কাছ থেকেই একটা পোড়া গন্ধ আসছে। মা ডাকতে লাগলেন, মীনা ! মীনা!

কোনো সাড়া নেই। মা আবারো ডাকলেন, মীনা দরজা খোল! মীনা! টুসী! মীনা! আগুন! আগুন!

মীনা দরজা খুলছে না। টুসীর মা চিৎকার করে কাঁদছে। আশেপাশের সবাই চলে আসলো, বাড়িওয়ালাও। টিনের দরজায় জোরে জোরে বাড়ি দিতে থাকল কয়েকজন।

মীনা চোখ ডলতে ডলতে দরজা খুলল। কিছু না বুঝেই মীনা জানতে চাইল, কী হইছে?

কেউ কোনো কথা না বলে দৌড়ে ঘরে গেল।

দেখা গেল, খাটের ওপর কয়েল ধরানো। টুসীর মাথা থেকে দু আঙুল দূরে আগুন জ্বলছে। মনে হচ্ছে আগুন টুসীর কপালে চুমু খাওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে। পাশে বিছানা, কাঁথা, বালিশ জ্বলছে।

টুসীকে দৌড়ে কোলে নিলো টুসীর মা।

লোকজন তাড়াতাড়ি বালতিতে পানি এনে ঢালতে লাগল। বিছানাপত্র নামিয়ে ফেলল কেউ কেউ। ভেজা কাঁথা এনে চেপে ধরল আগুনের ওপর কেউ একজন। মীনা অবাক হয়ে দেখতে লাগল, কী করছে সবাই।

আগুন নিভে গেল। মীনা ভয়ে ভয়ে মায়ের কাছে এসে বলল, টুসীমণিকে অনেক মশা কামড়াচ্ছিল। তাই কয়েল টুসীর মাথার কাছে রাখছি। আমি তো বুঝি নাই আগুন টুসীমণিকে চুমো খেতে আসবে, আর সব পুড়িয়ে ফেলবে।

হু হু করে কেঁদে ফেলল মিনা। এমন ভুল ও আর করবে না। কাপড়ের কাছাকাছি জ্বলন্ত কয়েল রাখতে নেই, ও খুব বুঝে গেছে।

গল্প-২

অঙ্কুর

জান্নাতুল ফেরদৌস আইভী

অঙ্কুর আর টুনটুনি গল্প করতে করতে স্কুলের গেটের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ অঙ্কুর থেমে গেল। স্কুলের একজন অতিথির দিকে তাকিয়ে ওরা দুজনে কিছুটা থমকে গেল, কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকল।

নীলিমার গলায় আর মুখে অনেকটা পোড়ার ক্ষত। ওকে দেখে অনেকেই বেশ লম্বা সময় তাকিয়ে থাকে। অনেকে আবার ঝট করে চোখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলেও আবার আড়চোখে কয়েকবার তাকায়। মাঝে মাঝেই ওর অনেক কান্না পায়, মানুষ কেন বোঝে না যে ওর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল? কেন বোঝে না যে অন্যরা যখন এমন করে তাকায়, তখন ওর কতটা কষ্ট লাগছে? ওদের এমন তাকানোর কারণে প্রায় প্রতিদিনই নীলিমার মনে পড়ে যায়, সেই ১৪ বছর আগে ওর সেই দুর্ঘটনার দিনের কথা। রান্না করার সময় ওড়না দিয়ে ধরে কড়াই নামানোর সময় ওর ওড়নায় আগুনের আঁচ লেগে গিয়ে ওর পুরো পোশাকে আগুন লেগে গিয়েছিল, তখন তো জানতই না যে ও তারপর আর বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকাটা অনেক আনন্দের, ওর দিকে তাকিয়ে যারা দৃষ্টি দিয়ে অনেক দুঃখ দেয়, সেই দুঃখ পাওয়ার থেকে অনেক বিশাল আনন্দের হলো প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকা।

নীলিমা তারপরও মাঝে মাঝে কিছুটা থমকে যায় যখন কোনো শিশুর সঙ্গে ওর প্রথম দেখা হয়। যে-কোনো শিশুর সাথে নতুন পরিচিত হওয়ার সময় প্রতিবারই ওর ভেতরে একটা অজানা আশঙ্কা কাজ করতে শুরু করে। আজও তেমন হলো, ওদেরকে সহজ করতে নীলিমা নিজেই জিজ্ঞাসা করল, ভয় পেয়েছ?

টুনটুনি চুপ করে থাকলেও অঙ্কুর বলে, না না, আমরা একটা পোকা দেখে ভয় পেয়েছি।

ওদের কথার স্বতঃস্ফূর্ততায় মুগ্ধ হয়ে যায় নীলিমা। ও জিজ্ঞাসা করে, কোথায় পোকা? পোকা তো আমিও খুব ভয় পাই।

এবার টুনটুনি কথা বলে ওঠে, না, না ওরকম না। এই পোকাটা উড়তে পারে। ওর নাম 'বেলুন পোকা'।

বেলুন পোকা?

আমরা নাম দিয়েছি বেলুন পোকা। তুমি সত্যিই পোকা ভয় পাও?

হ্যাঁ, সত্যি। তবে সবচেয়ে ভয় পাই ওই পোকাটা

যেটার কথা তোমাদেরকে বললাম। আমি যখন তোমাদের মতো ছোটো ছিলাম, তখন থেকেই ভয় পেতাম, এখনও ভয় পাই।

ওরা খিলখিল করে হেসে ওঠে। এ সময় অফিস সহকারী এসে ডাক দেয়, আপা আসেন, স্যার আপনাকে ডেকেছেন। নীলিমা ওদের দুজনের কাছ থেকে হেসে বিদায় নিয়ে প্রিন্সিপাল স্যারের সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে যায়।

স্কুল হোস্টেলের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্যার বললেন, ১৯৭৭ সালে একজন ব্রিটিশ উদ্যোক্তার চেষ্টায় স্থাপিত হয় অন্ধ মেয়েদের জন্য আবাসিক এই স্কুল। প্রথমে সম্পূর্ণ ডোনেশনভিত্তিক ছিল। সময়ের ধারাবাহিকতায় অর্থসংস্থানের প্রয়োজনে স্কুল কর্তৃপক্ষ ২০০৩ সাল থেকে সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় শিশু শ্রেণিতে অন্য শিশুদেরকেও ভর্তি করা শুরু করেন। ২০০৮ সালে ক্লাস সিক্স-এর সমন্বিত ক্লাস শুরু হলো। আপনি যে শিশুদের সঙ্গে কথা বলছিলেন ওরাও এই সমন্বিত ক্লাসের মাধ্যমেই শিক্ষা গ্রহণ করছে। এ বছরে আমাদের হাই স্কুলের থেকে মোট নয়জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় মেধাবী ফলাফল অর্জন করেছে। ওদেরকে আমরা একটি সরকারি কলেজে ভর্তি করিয়েছি। এই নয়জনের কেবল একজন সূর্যের আলোতে দেখতে পায়, আলো যেখানে কম সেখানে ও দেখতে পায় না। আর এই একজনই বাকি আটজনের পথের দিশারি। তবে ওখানে হোস্টেলে সিটের সংখ্যা খুব কম। আমাদের মেয়েদের জন্য ঢাকা শহরের লোকাল বাসে চড়ে প্রতিদিন মিরপুর থেকে পুরোনো ঢাকায় যাতায়াত করা খুব কষ্টকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী এখানে কেবল এসএসসি পাস করা পর্যন্ত ওরা থাকতে পারবে। এরপর কলেজ পর্যায়ে কলেজের আবাসিক হলে থাকার ব্যবস্থা করে ওদরেকে ওখান থেকে চলে যেতে হবে। ওরা তাই ওদের কলেজের হোস্টেলের সিটের বিষয়ে সহযোগিতা পাবার জন্যে আপনাদের অফিসের সহযোগিতার আবেদন করেছিল।

নীলিমা প্রিন্সিপ্যাল স্যারের রুম থেকে বের হয়ে চোখ জুড়িয়ে নেয় স্কুলের মাঠের চারপাশের বৃক্ষরাজি দেখে। এতটা পরিকল্পিত বাগান এই ঢাকার ভেতরেই হতে পারে তা চোখে না দেখলে কেউ বুঝবে না। পুরো স্কুল জুড়ে কয়েক হাজার গাছ। নীলিমা জানল, স্কুলের বাচ্চারাও গাছগুলোর পরিচর্যা করে। প্রতি মাসে একদিন করে প্ল্যান্টিং ডে আছে। ঐদিন ক্লাস সিক্স থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত যে-কোনো একটা ক্লাসের শিক্ষার্থীরা ২ ঘণ্টা করে বাগানের কাজ করে নিয়ম মতো।

নীলিমা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ে কাজ করছে এমন একটি মানবাধিকার সংস্থায় চাকরি করে। ওর অফিস থেকে নির্দেশনা দিয়েছিল বিষয়গুলো ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। সময় নষ্ট না করে ঐদিনই নীলিমা সেই মেয়েদের ভর্তি হওয়া কলেজের অধ্যক্ষের সাথে দেখা করতে যায়। কলেজের অধ্যক্ষ জানালেন, হোস্টেলের অন্য মেয়েরা অন্ধ ছাত্রিদের সাথে থাকতে আপত্তি করেছে। তাছাড়া তাদেরকে বিশেষভাবে যত্ন নেওয়াটাও হোস্টেল কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কলেজের হোস্টেলে ওদের জন্য সিটের ব্যবস্থা করা আপাতত সম্ভব নয়। ওদের জন্য আপনারা অর্থাৎ ওদের বিষয়ে ভাবেন এমন সংস্থার পক্ষ থেকে আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

নীলিমা সাধ্যমতো চেষ্টা করে বোঝানোর। বলে, ওরা যদি মিরপুর-১০ থেকে পাবলিক বাসে চড়ে নিয়মিত আজিমপুরে চলাচল করতে পারে তবে ওরা নিশ্চয়ই পরনির্ভরশীল নয়। আর রুমমেট হিসেবে যদি অপ্রতিবন্ধী মেয়েরা ওদের সাথে থাকতে আপত্তি করে থাকে তবে ওদেরকে আলাদা একটি রুম বরাদ্দের কথা ভাবতে অনুরোধ করে।

নীলিমার বিনয় আর যুক্তির কথা শুনে অধ্যক্ষ ওকে কিছুটা আশ্বাস দিয়ে বলেন যে আমাকে কিছুদিন সময় দেন। আমি আগামী মিটিং-এ সবার মতামত নিয়ে তারপর আপনাকে জানাব। নীলিমা অনেকটা ক্লান্ত হয়ে যায় বলে হেসে বিদায় নিলেও মনের ভেতরে ও খুব বিমর্ষ হয়ে অধ্যক্ষের রুম থেকে বেরিয়ে আসে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসার সময়েও কলেজের মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখে একটিও গাছ নেই মাঠের চারিদিকে। মনের অজান্তেই নীলিমা চলে যায় আজ সকালের সেই স্কুলের গাছঘেরা সবুজ গেটে, সেখানে সেই চড়ুইপাখির মতো কিচিরমিচির করা শিশু দুটির কথা কানে প্রতিধ্বনি হতে থাকে। যারা ওর চেহারার অস্বাভাবিকতায় থমকে গিয়েও প্রকাশ করল না, ওর মনে আঘাত দেবে না বলে। যে ছোট্ট শিশুরা জানে কষ্ট না দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে পোকার গল্প বলা, উড়তে পারে

বলে ওরা নাম না জানা পোকার নাম দেয় 'বেলুন পোকা'। শিশুদের কল্পনাশক্তি আর মানবিকতাকে প্রসারিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন সমন্বিত স্কুলের শিক্ষকেরা, ঐ স্কুলের খেলার মাঠ, গাছের পাতা আর গাছে বসা কিচিরমিচির করা পাখিরা মিলে।

শিশু বয়সটিতে যদি প্রতিবন্ধী বন্ধুদের সাথে একসাথে পড়ার আনন্দের একটি বীজ তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থায় রোপণ করে দেওয়া হতো, তাহলে সেই অঙ্কুর আজকে হয়ত একটি পরিপূর্ণ বৃক্ষ হয়ে আজকের প্রতিবন্ধী মেয়েগুলোর মাথায় ছায়া দিতে পারত!

দুই সপ্তাহ পর নীলিমার অফিসে ফোন করে অধ্যক্ষের অফিস থেকে জানানো হলো যে কলেজ কর্তৃপক্ষ নয়জন শিক্ষার্থীর জন্য কলেজে একটি রুম বরাদ্দ দিয়েছেন। এই খবর শুনে নীলিমার খুব আনন্দ হয়। সেই ক্লাস থ্রিতে পড়া শিশুদের নিয়ে একদিন ও কলেজটাতে বেড়াতে যাবে নিশ্চয়ই। শিশুদেরকে ১০০টা গাছের চারাও কিনে দেবে ও। সেগুলো ওরা কলেজের অধ্যক্ষের হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেবে এবং ওদের স্কুলে কী কী ফুলের গাছ আছে তার নাম বলবে।

যা কিছু সুন্দর শিক্ষা তা অঙ্কুর বয়স থেকেই আমাদের শেখার পরিবেশে মিশে যাক, নীলিমা তেমনটিই ভাবল।

হেমন্তের গান

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

কোনো মাঠে কাঁচাপাকা, কোনো মাঠে শুধু পাকা ধান
কিষানেরা ধান কাটে, তার সাথে ভেসে আসে গান।

কেউ বাঁধে আঁটি আর কেউ দেখে রাখে সারি সারি
কেউ দেখো বাঁকে তুলে আঁটিগুলো নিয়ে যায় বাড়ি।

কিষানিরা ধান ভানে ছন্দ জাগে বড়োই মধুর
দিন এল নবান্নের প্রাণে প্রাণে বাজে কত সুর।

যে দিকেই চোখ যায় সেদিকেই ধান আর ধান
কেউ লিখে কেউ গায় মন খুলে হেমন্তের গান।

নবান্ন

সালেহীন

হিম কুয়াশার আবরণে
ঠান্ডা হাওয়া বয়
ফোঁটা ফোঁটা শিশির পড়ে
ঘাস ভিজে রয়।

পাক ধরেছে ধানের ক্ষেতে
কৃষকেরা আনন্দে মাতে
নতুন চালে হবে মিষ্টান্ন
ঘরে ঘরে নবান্ন।

ষষ্ঠ শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি

আবুল কালাম আজাদ

বড়োমামা বললেন, মুক্তিযোদ্ধারা নভেম্বর মাসেই ঢাকাকে মুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছিলেন। পূর্ব বাংলার চারদিকের বর্ডারে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের চাপ খুব বেড়ে গেছে। কিন্তু পাকিস্তানি জঙ্গি শাসকরা সেটা স্বীকার করতে চায় না। তারা এটাকে ভারতীয় হামলা বলে প্রচার করতে থাকে। নভেম্বরের ২৩ তারিখ 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর আট কলাম জুড়ে হেডলাইন ছাপা হয়—ভারতের সর্বাত্মক আক্রমণ। মিথ্যাই ছিল ওদের প্রথম ও শেষ আশ্রয়।

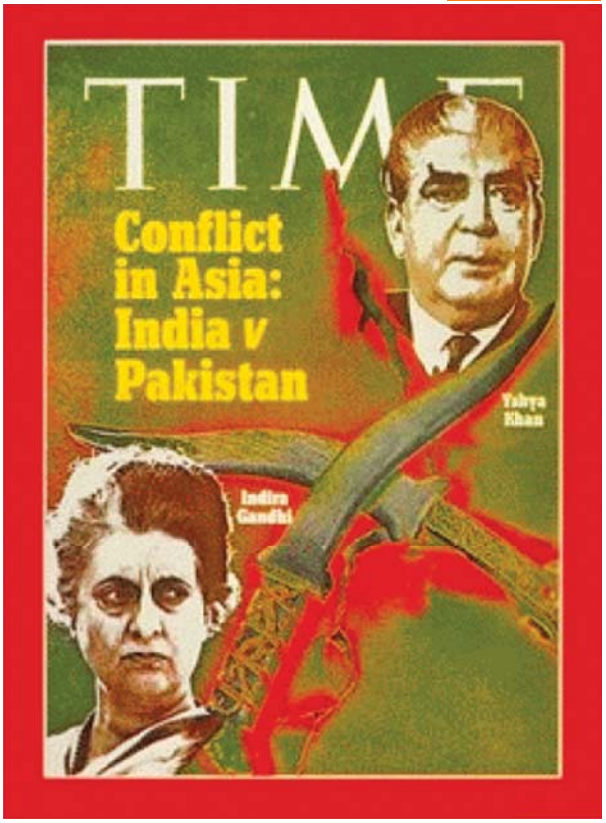

২৪শে নভেম্বর পাকিস্তান সরকার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ঐ দিনই সন্ধ্যায় ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ আর টঙ্গিসহ শহরের আশপাশে ব্ল্যাক আউট বা নিষ্প্রদীপ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। পত্রিকায় পরিখা খননের খবর প্রকাশ করে। যুদ্ধ যুদ্ধ করে পাকিস্তান বড়োই বিচলিত হয়ে পড়ে। আসলে তারা ঠিকই বুঝে গেছে যে, তারা অন্তিম অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

নভেম্বরের শুরুতেই পৃথিবীর কয়েকটি দেশের দূতাবাসের কর্মকর্তারা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ফেলেছেন। নভেম্বরের ৩ তারিখে টোকিওতে পাকিস্তানি দূতাবাসের প্রেস অ্যাটাসে এস এম মাসুদ ও থার্ড সেক্রেটারি মোহাম্মদ আবদুর রহমান পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। সুইজারল্যান্ডে পাকিস্তানের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ওয়াকিলুর রহমান সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন।

রাজাকার বাহিনী আর ওদের এই দুই অঙ্গ সংগঠন আলশামস ও আলবদর বাহিনীর সদস্যরা ভীত হয়ে পড়ে। অনেক জায়গায়ই তারা মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। বিদেশি জাহাজগুলো চট্টগ্রাম বন্দরে আসতে ভয় পাচ্ছে। কারণ গেরিলারা বিদেশি জাহাজ ডুবিয়ে দিচ্ছে।

নভেম্বরের প্রথম দিকে এক কাণ্ড ঘটে যায়। একটি বিদেশি জাহাজ জয় বাংলা পতাকা উড়িয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে হাজির হয়। পাকিস্তানি সেনাদের তো রাগে ফেটে পড়ার অবস্থা। জাহাজের ক্যাপ্টেন বলল—নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা। পাকিস্তানি পতাকা দেখলেই গেরিলারা জাহাজ ডুবিয়ে দিচ্ছে। তোমরা তো একটা জাহাজও রক্ষা করতে পারছ না।

বন্দরের ইনচার্জ বলল—ঠিক আছে, জাহাজের লোকসান হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তবু তোমরা জয় বাংলা পতাকা উড়াবে না।

এরপর থেকে সব জাহাজই তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের লিখিত দলিল নিয়েছে। নভেম্বরের ৩ তারিখে দলিল নেবার এক ঘণ্টার মধ্যে একটি গ্রিক জাহাজ ডুবে গেল। এখন বুঝো পাকিস্তানি আর্মিদের অবস্থা। তারা কোনো দিকই সামাল দিতে পারছিল না। তারা ইন্ডিয়ার সাথে আলোচনা করতে চাইল। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তাদের সাথে কোনোরকম আলোচনায় বসতে নারাজ।

নভেম্বরের ৬ তারিখে ওয়াশিংটনের জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, কোনো সমাধানে উপনীত হতে হলে তা পূর্ববঙ্গের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের উপস্থিতি ছাড়া ভারত-পাকিস্তান আলোচনা অর্থবহ হতে পারে না। বরং তা সমাধানে পৌঁছাতে আরো জটিলতার সৃষ্টি করবে।

পাকিস্তান তলে তলে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা ভারতের সাথে যুদ্ধে জড়াবে। যুদ্ধটাকে ছড়িয়ে দিবে অনেক দূর। আমেরিকা আর চীনের কাছ থেকে তারা সাহায্য পাবে বলেই তাদের বিশ্বাস ছিল। তারা ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। ভারতও পালটা সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। ভারতের সাথে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার ওয়ার ফ্যাক্ট ছিল। ভারত আমেরিকা-চীনের ভয়ে ভীত হতে পারে না।

মুহিব চাচা বললেন, পাকিস্তানের অপশাসকরা তখন বুঝে গেছে যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আর পারা যাবে না। একের পর এক অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয়ে যাচ্ছে, স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। তারা আন্তর্জাতিক সাহায্য পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। যুদ্ধটাকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল।

নভেম্বরের ৯ তারিখে মার্কিন সাময়িকী 'নিউজ উইক'—এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেন, ভারত বিদ্রোহীদের পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশে সাহায্য করে চলেছে। ভারতীয় ট্রেনিং প্রাপ্ত বিদ্রোহীরা পূর্ব পাকিস্তানে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত। আমি এ ব্যাপারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছি। ভারত যদি বাংলাদেশের ধুয়া তুলে পূর্ব পাকিস্তান দখলের চেষ্টা করে, তাহলে যুদ্ধ বাঁধবেই। সে যুদ্ধ কেবল পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং সে যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি পরাজিত হব না। যুদ্ধ বাঁধলে চীন আমাকে অস্ত্র দেবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

১৮ই নভেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ফিলিপাইনস্থ পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত কে. কে. পন্নী, নয়াদিল্লিতে পাকিস্তানের কাউন্সিলর হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ও কাঠমান্ডুতে সেকেন্ড সেক্রেটারি এ এম মুস্তাফিজুর রহমানকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দেন। এ সকল কূটনীতিকবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। তারই জবাবে ২০শে নভেম্বর তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ভারত আশা করে জাতিসংঘ মহাসচিব পূর্ববঙ্গে গৃহযুদ্ধের অবসানে আত্মনিয়োগ করবেন। পূর্ববঙ্গের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাগ্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সমস্যাকে ধামাচাপা দিয়ে এটিকে একটি পাক-ভারত বিরোধে রূপান্তরিত করলে তা শুধু সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলবে। তিনি বলেন, আমি মহাসচিবকে এই নিশ্চয়তা দিতে চাই, পাকিস্তান আক্রমণ করার অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছাই আমাদের নেই। ঠিক তার পরের দিনই ২১ তারিখে টাইম সাময়িকীর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও অন্য পশ্চিমা নেতাদের কাছে এই মর্মে চরমপত্র দিয়েছেন যে, দুই সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হলে ভারত সরকার জাতীয় জরুরি ব্যবস্থা ঘোষণা করবে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি করবে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকাশ্যে সমর্থন দেবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত এক জরুরি পত্রে অবিলম্বে বাংলাদেশ সংকট সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। অবশ্য ইতোমধ্যে সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ২২শে নভেম্বর তারিখে ইয়াহিয়া জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

বড়ো চাচা বললেন, জালিম পাকিস্তানিদের তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। কারো কাছ থেকে সেই অর্থে সমর্থন পাচ্ছে না। যাদেরকে মুরুব্বি মেনে এসেছে, যাদের ওপর ভরসা করে বাঙালি নিধনে নেমেছিল তারা সরাসরি কোনো সাহায্য করছে না। শেষে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে ২৪শে নভেম্বর তারিখে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, উপমহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণে পাকিস্তান যে-কোনো বৃহৎ শক্তির উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে। উপমহাদেশের বর্তমান সংকট নিরসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি কোনো দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে তাকে স্বাগত জানানো হবে।

আচ্ছা, স্বাধীন বাংলার প্রথম সরকার গঠন করা হয়েছিল কোথায় তা কি তোমরা জানো? বড়ো চাচা প্রশ্ন করলেন।

আমি বললাম, মেহেরপুর জেলার বদ্যনাথতলার আমবাগানে।

ঠিক। তো সরকার গঠনের অল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানি বাহিনী সে অঞ্চল দখলে নিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে নভেম্বর তুমুল যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অঞ্চল স্বাধীন হয়ে যায়। হিলি ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি। হিলির পতন হলে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে উত্তর বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ২৭শে নভেম্বর তারিখে মুক্তিযোদ্ধা আর যৌথবাহিনীর সমন্বয়ে হিলির তিন দিক থেকে আক্রমণ করা হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রগতি ঠেকাতে পারেনি। হানাদাররা বেশ কয়েকটি ট্যাংক হারায়। আশি জন পাকিস্তানি হানাদার নিহত হয়। সেখানে তারা পরাজিত হয়। সত্যি কথা হলো, নভেম্বরের শেষ দিকে অঘোষিতভাবে ভারত তখন যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি সাহায্য করতে শুরু করে দিয়েছে। ২৮শে নভেম্বর সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পাঠানো এক পত্রে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তি দানের পরামর্শ দেন। এদিকে ২৮ তারিখেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর কাছে পত্র দেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী কোনো আপোশে যেতে রাজি নন। তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের সুদীর্ঘ সময়ের শোষণ ও নির্যাতনের অবসান চান। তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার পক্ষে। তাই ২৮শে নভেম্বর তারিখে রাজস্থানের জয়পুরে এক জনসভায় ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ভারত পূর্ববঙ্গের জনগণের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রশ্নে পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধের ব্যাপারে জাতিসংঘ অথবা বৃহৎ শক্তিবর্গের চাপের মুখে নতি স্বীকার করবে না। ২৯শে নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এমএজি ওসমানী মুজিবনগরে বলেন, আমার ছেলেরা এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মাত্র কয়েক মাসেই তারা পৃথিবীর যে-কোনো সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। আর দেরি নয়, এখনই চরম আঘাত হানতে হবে।

আমরাও বুঝে গেলাম নভেম্বরেই চরম আঘাত হানার সময়েই চলে গিয়েছিল আমাদের মহান মুক্তিযোদ্ধারা। দেশ স্বাধীনের আর বেশি দেরি নেই। নভেম্বরের পরেই ডিসেম্বর মাস। সেই মাসেই হবে আমাদের স্বাধীনতার গল্পের শেষ পর্ব। কেননা ডিসেম্বরেই পাকিস্তানি হানাদাররা পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। যৌথবাহিনীর সাথে মিলে তুমুল যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার টকটকে লাল সূর্যটাকে।

তাসনোভা আলম (লিশান), সপ্তম শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

বিচিত্র জগৎ

রহস্যময় স্থাপত্য

খালিদ বিন আনিস

গত সংখ্যাতেই জেনে গেছ, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু স্থাপনা রয়েছে যা নিয়ে এক পক্ষ দাবি করে যে, তা এই পৃথিবীর মানুষের তৈরি নয়। সেরকম স্থাপনার খবর থাকছে এ পর্বেও।

সাক্সাইওয়াম্যান

প্রাচীন ইনকা সভ্যতার কুসকো নগরীর অদূরেই রহস্যময় স্থাপত্যটির অবস্থান। আকার আকৃতি দেখে একে ইনকাদের দুর্গ কিংবা প্রাসাদ বলেই মত দিয়েছেন ইতিহাসবিদেরা। কিন্তু এটি তৈরির পদ্ধতি নিয়ে স্থাপত্যবিদেরা এখনও আঁধারে।

বিশাল পাথরগুলোকে এমনভাবে মাপ অনুযায়ী বসানো হয়েছে যে মনে হবে বিশাল আকারের ধাঁধা'র সমাধান করেছিল হারানো সভ্যতার মানুষেরা। সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার হচ্ছে, এটি তৈরিতে যেসব পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল তার কোনো কোনোটি প্রায় সাড়ে ৩শ পাউন্ডের চেয়েও বেশি ওজনের।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোন প্রযুক্তিতে এত ভারী পাথর দূরদূরান্ত থেকে এনে উঁচুতে তুলতে সক্ষম হলো প্রাচীন যুগের মানুষ? মিশরের পিরামিডের মতো এর নির্মাণশৈলী নিয়েও তাই রহস্যে আছে আধুনিক প্রকৌশলীরা। অনেক বিজ্ঞানী স্বীকারও করেছেন, জ্যোতির্বিদ্যায় অগ্রসর এই জাতি যেসব স্থাপত্য নির্মাণ করেছিল তার সবগুলোর পেছনেই মহাজাগতিক কারণ ছিল। শুধু দুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ইনকা জাতি কখনোই প্রায় ২০ মাইল দূর থেকে এসব পাথর বয়ে আনেনি। তাদের মতে, এই দুর্গ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ এবং যোগাযোগের চেষ্টায় ব্যবহৃত হতো।

তারা পরীক্ষা করে দেখেছেন, দুর্গের মাথায় একটি পাথর খুব যত্নের সঙ্গে রাখা ছিল। যার বিশেষত্ব হচ্ছে, সেটি ১২ কোনা বিশিষ্ট। অনেক চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই পাথরকে সম্ভবত তারা মহাকাশ পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করত। মজার ব্যাপার হলো, ইনকা সাম্রাজ্যের অন্য স্থাপত্যের ভেতরেও এমন বিশেষ পাথরের সন্ধান মিলেছে।

এলিয়েন বিশ্বাসীদের মতে, এসব স্থাপত্যের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে এলিয়েন প্রযুক্তি। যা এসেছে লক্ষ কোটি মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আসা ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান মানুষদের মাধ্যমে।

বিজয় ফুল উৎসব

শাহানা আফরোজ

বন্ধুরা, ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বিজয় ফুল প্রতিযোগিতা। নিশ্চয়ই সবাই অংশগ্রহণ করছ। জাতীয় ফুল শাপলাকে প্রতীক করে নতুন প্রজন্মের কাছে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উপলব্ধি এবং সংগ্রামী ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার জন্য বর্তমান সরকার এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে বিজয় ফুল তৈরি প্রতিযোগিতা এবং বিজয় ফুল উৎসব। এ বিজয় ফুলের ছয়টি পাপড়ির মাধ্যমে স্মরণ করা হবে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাকে আর মাঝের কলিটি হবে ৭ই মার্চের প্রতীক উন্নত মম শির। কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক বা শিট দিয়ে শিক্ষার্থীরা তৈরি করবে কোটি কোটি বিজয় ফুল। বিজয় ফুলের দৈর্ঘ্য হবে ছয় সে.মি. আর প্রস্থ হবে আনুপাতিক হারে।

স্কুল, কলেজ, মাদরাসা পর্যায়ের শিশু শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত 'ক' গ্রুপ, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি 'খ' গ্রুপ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি 'গ' গ্রুপে ভাগ হয়ে চলবে প্রতিযোগিতা। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর শ্রেণির মাধ্যমে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এরপর উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে বাছাই করা হবে। বিভাগীয় পর্যায়ের বিজয়ীরা অংশগ্রহণ করবে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায়। ২৮শে অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে ১৫ই ডিসেম্বর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করবেন।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজয় ফুল তৈরির পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প, কবিতা, রচনা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, অভিনয়, চলচ্চিত্র নির্মাণ, দেশাত্ববোধক গান ও জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। বিজয় ফুল এই প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটি কোনো অনুষ্ঠান নয়, উৎসব। প্রতিযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়া এর পূর্বশর্ত।

কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮

জান্নাতে রোজী

'মেধা ও মননে সুন্দর আগামী'-এই স্লোগানকে সামনে রেখে ২১শে অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮। সৃজনশীল ও জ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ দিয়ে দেশের ১১ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১ লাখ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৭১০ জন কিশোর-কিশোরী এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। পল্লি কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

ইউনিয়ন থেকে জেলা পর্যায় পর্যন্ত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা রচনা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, সাধারণ জ্ঞান, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে সৃজনশীল ও জ্ঞানভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চারটি ধাপে সেরাদের বাছাই করা হয় এ সম্মেলনের মাধ্যমে।

কিশোর-কিশোরী সম্মেলন- ২০১৮-এর উদ্‌বোধন করে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসলেও দারিদ্র্য দূরীকরণ এখনও সরকারের মূল লক্ষ্য। দেশে বর্তমানে প্রায় ৩ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। যার মধ্যে ১ কোটি মানুষ অতি দরিদ্র। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উন্নতির ধারা বজায় রাখতে হবে কমপক্ষে ৭ থেকে ১০ বছর। তবেই দারিদ্র্যের হার নেমে আসবে ১০ ভাগের নিচে। তিনি আরো বলেন, আমাদের বার্ষিক দারিদ্র্য দূরীকরণ হার এখনও দুই শতাংশের নিচে রয়েছে। এটাকে যদি আমরা দুই শতাংশে নিতে পারি তাহলে আগামী ১০ বছরে দেশ থেকে দারিদ্র্যতা দূর করতে পারব।

টেকসই উন্নয়নের প্রধান শর্ত হচ্ছে কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। এই মূলমন্ত্র নিয়েই পিকেএসএফ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, বিভিন্ন সম্প্রদায়, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, বয়স নির্বিশেষে সকলের টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি মানব মর্যাদা নিশ্চিত হয় সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সমন্বিত এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮-এর আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ।

সম্মেলনে আগত কিশোর, কিশোরী, শিক্ষক ও সুধীজনদের বক্তৃতা শেষে দ্বিতীয় পর্বে ছিল 'আনন্দময় অংশগ্রহণমূলক শিখনের মাধ্যমে নেতৃত্বও নৈতিকতা' বিষয়ক একটি কর্মশালা। শেষাংশে ছিল কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

শিরোপা জয়! সে তো সবসময়ই আনন্দের। তারপর সে জয় যদি হয় ভারত কিংবা পাকিস্তানের মতো বড়ো কোনো দলকে হারিয়ে। তাহলে তো কোনো কথাই নেই। ৩রা নভেম্বর নেপালকে ললিতপুরের আনফা কমপ্লেক্সে সেরকমই টাইব্রেকারের মাধ্যমে জয় এনে দিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল দল। সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ চ্যাম্পিয়নশিপের পঞ্চম আসরে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ পাকিস্তানকে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়ে বিজয় অর্জন করেছে আমাদের তরুণ সেনারা নির্ধারিত সময়ে ম্যাচটি ড্র ছিল ১-১ গোলে। এটা তাদের দ্বিতীয় শিরোপা। প্রথমবার জিতেছিল ২০১৫ সালে নিজেদের মাটিতে। সেবারও সফলতা এসেছিল টাইব্রেকারের মাধ্যমে। তবে তখনও প্রতিপক্ষ ছিল ভারত। গত আগস্টে ভুটানে অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের কাছে হেরে শিরোপা হারিয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। এবার একই টুর্নামেন্টে সেই শিরোপাটি অর্জন করল বাংলাদেশের ছেলেরা। ফাইনালের শিরোপা জয়ের মূল নায়ক ছিল মেহেদী হাসান। এই গোলরক্ষক টাইব্রেকারে পাকিস্তানের নেওয়া তিনটি শটই অসাধারণ দক্ষতার সাথে প্রতিহত করে হৃদয় ভেঙে দেয় পাকিদের।

টুর্নামেন্টর শিরোপা জেতার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি দলীয় (১৩) গোল এবং ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ গোলদাতাও হয়েছে বাংলাদেশের নিহাত জামান উচ্ছাস। টুর্নামেন্টের শুরুতে মালদ্বীপকে ৯-০ গোলে, নেপালকে ২-১ গোলে হারিয়ে 'এ' গ্রুপের সেরা হয়ে সেমিফাইনালে উঠে বাংলাদেশ। সেমিতে টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে।

জয়ের পর লাল-সবুজের পতাকা হাতে নিয়ে দলবেধে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠে সবাই, দলীয় কোচকে শূন্যে ভাসিয়ে 'বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্লোগানে মুখরিত হয় পুরো দল। এ এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, যা বার বার দেখতে চায় দেশবাসী।

সঠিক নিয়মে বেড়ে উঠি

মো. জামাল উদ্দিন

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সুস্থ থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে ঘুমকে। তাদের মতে, ভালো ঘুম হলে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকার পাশাপাশি বাড়ে কর্মক্ষমতাও।

ঘুমের অভাবে উচ্চ রক্তচাপ, ব্রেইন স্ট্রোক, হার্টের সমস্যার মতো পরিস্থিতির তৈরি হয়। 'জেএএমএ পেডিয়াট্রিকের' একটি জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে একদল গবেষক দাবি করেছেন, কিশোর-কিশোরীদের নিয়মিত ঘুমের সমস্যা হলে তা রূপ নিতে পারে মারাত্মক সমস্যায়। পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে তাদের মধ্যে দেখা দিতে পারে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ। মানুষের সঙ্গে উগ্র ব্যবহার, চিৎকার-চেঁচামেচি, ঝগড়া-ঝাটি, মারামারির মতো ঘটনা ঘটায়। প্রয়োজনীয় ঘুমের অভাবে তরুণদের মধ্যে হতাশার প্রবণতাও দেখা দেয়।

মার্কিন গবেষক দল ২০০৭ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তরুণদের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহারের ওপর জরিপ করে এই ফলাফল পান। চিকিৎসকদের মতে, সুস্থ থাকতে প্রতিদিন অন্তত ৮ ঘণ্টা ঘুমানো জরুরি। গবেষক দল দেখতে পান অধিকাংশ স্কুলগামী তরুণ-তরুণী প্রয়োজনীয় এই ৮ ঘণ্টা ঘুমায় না। এই কারণে তাদের ৭০ ভাগের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ দেখা দেয়।

তারপর আসে খেলাধুলা, দুটি কারণে খেলাধুলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, আউটডোর গেম যা সাধারণত মাঠে ক্রিকেট-ফুটবল খেলতে গেলে শারীরিক বিকাশ হয়, শরীরে রোদ লেগে ভিটামিন ডি তৈরি হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, খেলাধুলার মাধ্যমে মানসিক বিকাশ ঘটে, যা একই সঙ্গে মনকে সতেজও রাখে। মাঠে অনেকের একসঙ্গে খেলাধুলা করার ফলে নেতৃত্ব গুণ তৈরি হয়। এমনকি খেলায় হার মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়, যা পরবর্তী জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। খেলাধুলা অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। এসবই জীবনে আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাবার শক্তি জোগায়।

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

এ মাসের শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. সিলেট বিভাগের একটি জেলা, ৩. দক্ষ, ৪. দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর, ৬. কথা, ৭. যে গান গায়, ৯. ঈর্ষা, ১০. প্রভাত, ১১. একজন ভাষা শহিদের নাম

উপর-নিচ: ১. বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বন, ২. বাংলাদেশের একটি বিভাগ, ৩. ভ্রমণকারী, ৫. ঘোড়ার রাশ, ৮. ভুটানের মুদ্রার নাম

১		২			■	৩	
	■		■	■	■		■
	■	৪		৫	■		■
৬			■	৭			■
	■		■		■	■	৮
■	৯			■	১০		
■	■		■	■	■	■	
■	■	■	■	■	১১		

এ মাসের ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৩	×		-	৫	=	
+	■	×	■	+	■	-
	÷	২	+		=	৫
÷	■	-	■	-	■	+
২	×		-	৪	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	৩	-		=	৮

গত সংখ্যার শব্দ ধাঁধার সমাধান

ব	রি	শা	ল	■	ল	ব	ণ
ল	■	ল	■	ক	লা	■	■
■	■	গ	■	চু	ট	■	ব
লা	টি	ম	■	রি	■	প	ক্ষ
■	ক	■	সু	পা	রি	শ	■
মা	টি	■	■	না	■	ম	ই
■	কি	র	ণ	■	■	■	রা
■	■	■	■	■	পো	শা	ক

গত সংখ্যার ব্রেইন ইকুয়েশনের সমাধান

৮	+	৪	-	৭	=	৫
+	■	+	■	+	■	+
৭	+	৩	-	৬	=	৪
-	■	-	■	-	■	-
৬	+	২	-	৫	=	৩
=	■	=	■	=	■	=
৯	+	৫	-	৮	=	৬

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই ০১৫৩১৩৮৫১৭৫ বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-43, No- 5, November 2018, Tk-20.00

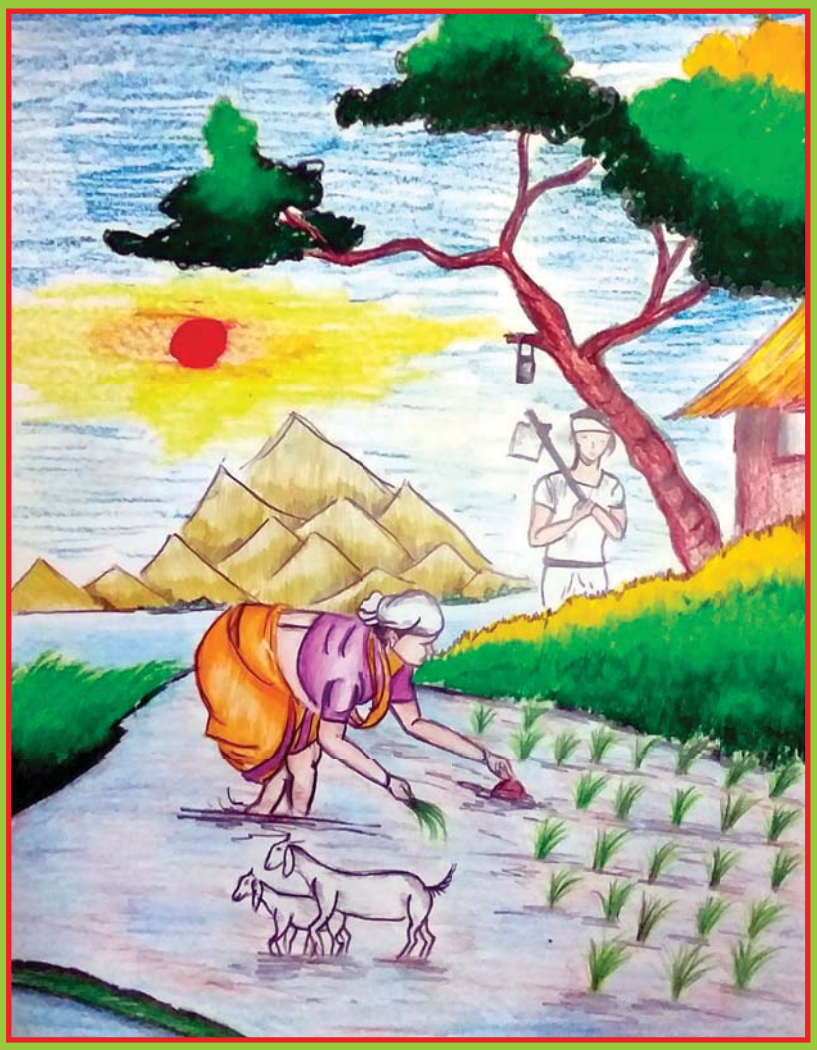

আদনান-আল-আসাদ, সপ্তম শ্রেণি, চৌগাছা শাহাদৎ পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা